পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানকর্মী সংস্থা প্রকাশিত
একটি সমাজ ও বিজ্ঞান বিষয়ক পত্রিকা

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী

সপ্তদশ বর্ষ তৃতীয় সংখ্যা □ জুলাই-সেপ্টেম্বর 1995 পাঁচ টাকা

এই সংখ্যায়

সূর্যগ্রহণ
কেন দেখবেন
জল দূষণের গোড়ার কথা
পরিবেশ দূষণ □ সুপ্রীম
কোর্ট ও ট্রেড ইউনিয়ন
তপসিয়ার চিঠি
আধিপত্য বনাম অধিকার
খড়দা মিশন কলেজের কাহিনী
ফ্রান্স ফের শুরু করল
নতুন মৌল না অন্য কিছু
বিউটি কনটেস্ট □ নারী
আন্দোলন কি বলছে

গণেশ জনগণেশ ও বিজ্ঞান

21শে সেপ্টেম্বর '95 হঠাৎই কলকাতা সহ সারা দেশ উদ্বেল হয়ে উঠেছিল। পাথরের মূর্তি—বিশেষত 'গণেশজী'—নাকি ছোট বড় নানা মন্দিরে, পথের ধারে, এমনকি গৃহস্থের বাড়ীতেও চামচে ধরা দুধ চোঁ চোঁ করে পান করেছেন। কাতারে কাতারে নরনারী এই অদ্ভুত 'অলৌকিক' কান্ড দর্শনে এবং ক্রিয়াটিতে অংশ গ্রহণে উন্মত্তের মতো ছোটাছুটি করেছেন। এমনকি কোথাও কোথাও জেলাশাসক, প্রধান বিচারপতি, মন্ত্রীরাও ভক্তিভরে 'গণেশজী'কে দুগ্ধপান করানোর অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছেন। পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণে দিনের বেলায় 'আঁধার' নেমে আসার মতই বিংশ শতাব্দীর শেষ লগ্নের 'আধুনিক' ভারতে যেন নেমে এলো মধ্যযুগীয় অন্ধকার!

আশার কথা, সব মানুষই গুজবে মেতে উঠে কান্ডজ্ঞান বিসর্জন দেননি। কৌতূহল অবশ্যই ছিল। ঘটনাটা চাক্ষুষ দেখে কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হবার প্রয়াস পেয়েছেন অনেকেই, এবং প্রায় প্রতিটি সংবাদপত্রেই পরদিন উন্মত্ততার খবরের পাশাপাশিই প্রকাশিত হয়েছে সম্ভাব্য কারণের সহজ বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা। বিজ্ঞানীদের বা বিজ্ঞানবাদীদের ব্যাখ্যায় মুগ্ধ হয়েই যে পরদিন থেকেই উন্মাদনা প্রায় উধাও হয়ে গেল এমন মনে করার কোন কারণ নেই—কিন্তু এই 'চমৎকারও' সত্যি সত্যি ঘটেছে; সাধারণ মানুষের—জনগণেশেরও একটি যুক্তিবাদী সত্তার অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায় কি?

তাই বলে, এমন ভাবনার মধ্যে শ্লাঘার অবকাশ সত্যি কতটুকু আছে? বিজ্ঞান-কারিগরীর আধুনিকতম কৌশলকে কাজে লাগিয়ে—উপগ্রহ যোগাযোগ ব্যবস্থার সুযোগ নিয়ে পরিকল্পিতভাবে গুজব ছড়িয়ে—লক্ষ কোটি শ্রমদিবস নষ্ট করে গণেশজীর মাহাত্ম্য প্রচারের এমন 'ঘটা'

যারা করতে পারল ; 'উচ্চশিক্ষিত' মন্ত্রী, আমলা, বিচারপতি ইত্যাদিরা সাধারণ কাণ্ডজ্ঞান বিসর্জন দিয়ে যেভাবে জনমানসে উন্মাদনা ও বিভ্রান্তি ছড়ালে, তাতে এমন মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে যে—ষড়যন্ত্রকারীদের 'পরিকল্পনা' সার্থক হয়েছে। সারা দেশ জুড়ে কয়েকশো 'গণেশজী'র মন্দির প্রতিষ্ঠা, কোটি কোটি কালো টাকার 'সদ্গতি' বিশেষ বিশেষ রাজনৈতিক দলের ভোট বাক্সে জনগণেশের কৃপা বর্ষণ—এসব তো হতেই পারে। এগুলি আমাদের জাতীয় গৌরব না জাতীয় লজ্জার চিহ্ন তা নিয়ে তর্ক করতে চাই না, বরং ভাবি, আধুনিক ও বিজ্ঞানমনস্ক হয়ে উঠতে চাওয়া বিশাল ভারতের বৈজ্ঞানিক ক্রিয়াকাণ্ড-শিক্ষা-গবেষণার যে মোটামুটি ব্যাপক আয়োজন তা আরো কতবার কতদিন এমনতরো ধর্ষণের শিকার হবে ? পাথর বা বস্তুখণ্ডের উপাদান, আকার-আকৃতি, গঠন, সচ্ছিদ্রতা—দুধ শোষণের জন্য কতটা দায়ী, দুধ বা যে কোন তরলের পৃষ্ঠটান (সারফেস টেনশন) বা সান্দ্রতাই (ভিস-কসিটি) বা তাতে কিভাবে কাজ করে এবং এ ব্যাখ্যা আদৌ সম্পূর্ণ কিনা—এসবই এক্ষেত্রে গৌণ ব্যাপার। তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ যে লাখো কোটি মানুষ 'গণেশজী'কে দুধ খাওয়াবার বিশ্বাস ও আশা নিয়েই মন্দিরে ছুটেছেন, হাজার হাজার উৎসুক চোখ যেখানে দৈবী দুগ্ধপান দেখতেই উদগ্রীব, কে সেখানে খেয়াল রাখে চামচ কতটা হেলিয়ে ধরা হল, দুধ গড়িয়ে কোথায় গেল ? সমস্ত ভুলের সম্ভাবনা সচেতনভাবে এড়িয়ে কেউ তো ঐ পরিস্থিতিতে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার চেষ্টা করতে পারেন না—এমনকি বিজ্ঞানীও না। কাজেই চৌ চৌ বা শোঁ শোঁ করে বা ঢক ঢক করে 'গণেশজী'র দুধ খাওয়ার 'পর্যবেক্ষণ'টাই বা মানতে হবে কেন— ? এ প্রশ্ন আমরা তুলতে পারিনি, পারিনি বিচার করতে—জনবিশ্বাসের মনস্তত্ত্বের ক্ষমতা, পারিনি আঁচ করতে বৈজ্ঞানিক কৃৎকৌশল যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে—অন্ধকারের—কুসংস্কারের—নেশার ব্যাপ্তির ক্ষমতা, পারিনি এসবের 'গবেষকদের' ধূর্ততার পরিমাপ করতে। আর তাই বিজ্ঞান ব্যর্থ হয়েছে তার অন্যতম শর্ত তথা ধর্ম পালনে—'গণেশজী'রা যে এভাবে দুধ 'খান' না—'খেতে' পারেন না—তার আগাম বার্তা ঘরে ঘরে পৌঁছে দিতে। আর সেটা সম্ভবও হবে না যতদিন না আমাদের শিক্ষা বিজ্ঞানসম্মত হয়, যতদিন না আমাদের বিজ্ঞানশিক্ষা বৈজ্ঞানিক ও মানবিক মূল্যবোধকেও তার অঙ্গীভূত করে। সেটা সম্ভব হ'লে হাজার হাজার লিটার দুধ গণেশজী না খেয়ে হাজার হাজার শিশু অনেকদিন ধরে সে দুধ খেতে পেতো। গুজব ছড়াবার জন্য উপগ্রহসমন্বিত যোগাযোগ ব্যবস্থা ষড়যন্ত্রীদের হাতের মুঠোয় আসার আগেই স্কুলের শিশুরা পেতো ন্যূনতম সরঞ্জাম, পরীক্ষা-নিরীক্ষার আত্মবিশ্বাস আর পানীয় জল !

যতদিন তা না পারা যাচ্ছে, আমাদের চোখের সামনে দিয়েই ঘটতে থাকবে একের পর এক 'চমৎকার'—'গণেশজী'র গণ হিস্টিরিয়া থেকে 'হনুমানজী'র গণ-অভ্যুত্থান, হজরতীয় অনুরূপ কোন চমৎকার থেকে মাতা মেরী বা ত্রাতা যিশুর যণ-মাহাত্ম্য। □

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী

লেখা বা রিপোর্ট পাঠান
যোগাযোগ
অভিজিত লাহিড়ী
পি 252 লেকটাউন ব্লক এ, কলিকাতা-700 089, ফোন 34-7982
সুভাষ গাঙ্গুলী
বি 22/8 করুণাময়ী হাউজিং এস্টেট, সল্ট লেক, কলিকাতা-700 091 ফোন 359-0297

সূচীপত্র

গণেশ জনগণেশ ও বিজ্ঞান 1 □ পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ দেখুন 3 □ বিষয়ঃ পরিবেশ—দূষণের মাপ ও মাত্রা 7 □ সুপ্রীম কোর্টের রায় ও অসহায় ট্রেড ইউনিয়ন 11 □ তপসিয়ার চিঠি 16 □ রহড়া রামকৃষ্ণ মিশন কলেজ ও কোর্টের রায় 19 □ ফ্রান্স ফের শুরু করল নিউক্লিয়ার বিস্ফোরণ 22 □ নতুন মৌল আবিস্কার 25 □ সৌন্দর্য্য প্রতিযোগিতা ও নারী আন্দোলনের প্রতিবাদ 26 □ কবিতা—বিষয় সূর্যগ্রহণ 29

পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ দেখুন

আগামী চব্বিশে অক্টোবর মঙ্গলবার —একটি বিশেষ দিন। সূর্যগ্রহণ হবে সেদিন। যেমন তেমন নয়। পূর্ণগ্রাস গ্রহণ। দেখা যাবে আমাদের দেশের বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে। সেই রাজস্থান, উত্তরপ্রদেশ, বিহার থেকে পশ্চিমবঙ্গ অবধি। ঠিক কলকাতায় বসে পূর্ণগ্রাস দেখা যাবে না। একটু দক্ষিণে নেমে গিয়ে দেখতে হবে। এবং দেখতেই হবে। বন্ধু-বান্ধব বাড়ীর লোকজন নিয়ে। এমন সুন্দর একটি প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখার সুযোগ ছাড়বেন না। বিরল এই সুযোগ। এত কাছাকাছি আরেকবার এ দৃশ্য দেখতে হলে অপেক্ষা করতে হবে অন্তত দু'তিনশ বছর!

আংশিক গ্রহণ প্রায় সকলেই দেখেছেন। জানেন গ্রহণ দেখতে কেমন। সেই থেকে যদি মনে করেন পূর্ণগ্রাস এমন আর কি বেশী দেখার?—গোটা সূর্যটাই ঢেকে গিয়ে অন্ধকার নেমে আসবে। —এই তো? তা'লে বলব—না। এইটুকুই না। আরো অনেক কিছু। এমন কিছু যা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না।

সূর্য আসলে দেখতে কেমন

প্রশ্নটার কোন মানে হয় না ভাবছেন তো? বলবেন, কেন—গোল থালার মত। সবাই জানে। কিন্তু যদি বলি—উঁহু, ঠিক হল না। একটা গ্যাসের পিণ্ড কিভাবে নিটোল গোলাকৃতি হয়? কিভাবে তার এমন নির্দিষ্ট সীমানা থাকে? থাকতে পারে না। আর নেইও। তবে হ্যাঁ চোখে দেখি বটে সাদা জ্বলন্ত একখানা থালার মত।

আসলে এটা সূর্যের অভ্যন্তরের একটি স্তর। যে স্তরের ঔজ্জ্বল্য সব থেকে বেশী। এর বাইরেও আছে এর তিন চার গুণ অংশ। যে অংশের উজ্জ্বলতা অপেক্ষাকৃত কম। ফলে সে অংশটি স্বাভাবিক অবস্থায় আমাদের চোখে ধরা দেয় না। আর সাদা উজ্জ্বল স্তরের অভ্যন্তরের অংশ তো দেখার প্রশ্ন নেই।

পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণের সময় সূর্যের এই উজ্জ্বলতম অংশ (ফোটোস্ফিয়ার) যখন চাঁদের আড়ালে ঢাকা পড়ে তখন তার চারদিকের অপেক্ষাকৃত অনুজ্জ্বল অংশটি আমাদের চোখের সামনে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। অনির্বচনীয় সুন্দর সে দৃশ্য। মাঝখানে গোলাকার অন্ধকার। আর তার চারদিক দিয়ে নীলাভ আলোর ছটা যেন গলে গলে পড়ে। এরই নাম সৌরমুকুট বা ইংরেজীতে যাকে বলে 'সোলার করোনা'। এই আলোর মুকুটের বিস্তার সব দিকে সমান নয়। আবার সব পূর্ণগ্রাসেও এর আকৃতি এক থাকে না। কোন কোন পূর্ণগ্রাসে এই আলোর মুকুট সূর্যের উজ্জ্বলতম অংশের তিন-চার গুণ ব্যাসযুক্ত হয়।

পূর্ণগ্রাসের স্থায়িত্ব

পূর্ণগ্রাসের পর্বটি খুব বেশী সময়ের নয়। স্থান ভেদে কয়েক মিনিটের। সর্বোচ্চ সময় হতে পারে সাড়ে সাত মিনিট। কালে ভদ্রে তেমন গ্রহণ হয়। আগামী দিনে এমন একটি গ্রহণ দেখা যাবে এখন থেকে 173 বৎসর পর। 2168 সালের 5ই জুলাই!

গ্রহণ শুরু হওয়াটাকে চালু কথায় বলে 'গ্রহণ লাগা'। গ্রহণ কখন লাগবে নির্ভর করে ভূপৃষ্ঠের কোথায় দাঁড়িয়ে আছি তার ওপর। অর্থাৎ স্থানের অক্ষাংশ-দ্রাঘিমাংশের ওপর। আগামী চব্বিশে অক্টোবরের গ্রহণের কথা ধরা যাক। দক্ষিণবঙ্গের ডায়মণ্ড হারবার থেকে যদি দেখার কথা ভাবি তাহলে সেখানে গ্রহণ লাগবে সকাল 7টা বেজে 32 মিনিট 6 সেকেণ্ডে। ছাড়বে বেলা 10টা বেজে 17 মিনিট 47 সেকেণ্ডে। এর মধ্যে পূর্ণগ্রাস গ্রহণ শুরু হবে সকাল 8টা বেজে 48 মিনিট 56 সেকেণ্ডে। আর শেষ হবে 8টা বেজে 50 মিনিট 9 সেকেণ্ডে। অর্থাৎ পূর্ণগ্রাসের স্থায়িত্বকাল হল 1 মিনিট 13

সেকেন্ড। আবার বজবজ কিংবা ঘাটালে গেলেই এই সময় ভিন্ন হবে। —1 মিনিট 3 সেকেন্ড। গ্রহণ দর্শনার্থীদের পক্ষে পূর্ণগ্রাসকালের এই সময়টুকুই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

ফসকে গেছিল আর কি

সূর্যগ্রহণ কিভাবে হয় সকলেই জানেন। পূর্ণগ্রাস হয় কিভাবে সেও। কিন্তু ভেবে দেখেছেন কি একটি আকস্মিক যোগাযোগের কারণেই পৃথিবীর মানুষ এমন অপূর্ব এই দৃশ্যটি দেখতে পান? যেটা পৃথিবীর প্রতি প্রকৃতির বিশেষ পক্ষপাতিত্বও বলতে পারেন!

পৃথিবী থেকে সূর্য এবং চন্দ্র ভিন্ন ভিন্ন দূরত্বে অবস্থান করছে। অথচ সূর্য এবং চন্দ্রকে একই মাপের দেখায়। কারণ সূর্য যেমন অনেক দূরে রয়েছে তেমনি আকারেও সে বড়। চাঁদ আকারে অনেক ছোট। কিন্তু আকস্মিকতার ব্যাপার হল সূর্য চন্দ্রের চেয়ে আকারে যেখানে প্রায় চারশ গুণ বড়, তেমনি পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্বও পৃথিবী থেকে চন্দ্রের দূরত্বের প্রায় চারশ গুণ! ফলে পৃথিবী থেকে সূর্য এবং চাঁদকে আমরা প্রায় একই মাপের দেখি। এই হিসেবের সামান্য হেরফের হলেই হয়েছিল আর কি! দেখতে পেতাম না এই মনোরম দৃশ্য। আরও বহুদিন হয়তো জানতেও পারতাম না সূর্যের দৃশ্য অংশের বাইরেও রয়েছে এতখানি সূর্য! তবে কক্ষপথে এদের অবস্থানভেদে এদের মাপে সামান্য হেরফের দেখি। কখনও চাঁদের মাপ সূর্যের চেয়ে একটু বড় হয়। কখনও উল্টোটা।

এমন যদি হয় যে পৃথিবী থেকে সূর্য আছে একটু বেশী দূরে এবং চাঁদ আছে একটু বেশী কাছে তাহলে চাঁদকে দেখতে একটু বড় হবে। সূর্যকে ছোট। এই অবস্থায় যদি সূর্যগ্রহণ হয় তাহলে সূর্যের উজ্জ্বলতম ফোটোস্ফিয়ার অংশটি পুরোপুরি ঢাকা পড়বে চাঁদের আড়ালে। এমন অবস্থাতেই কালো চাঁদের আড়াল থেকে উঁকি মারবে সূর্যের অপেক্ষাকৃত অনুজ্জ্বল অংশ। —সৌরমুকুট।

আবার যদি উল্টোটা হয়—অর্থাৎ সূর্য আছে তুলনামূলকভাবে কাছে এবং চাঁদ আছে দূরে, সেক্ষেত্রে চাঁদের মাপ হবে সূর্যের চেয়ে ছোট। ফলে এই অবস্থায় পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণের সময় চাঁদ সূর্যকে পুরোটা আড়াল করতে পারবে না। অন্ধকার চাঁদের পেছন থেকে বালার মত উঁকি মারবে সূর্যের উজ্জ্বল অংশটি। দেখা যাবে না রহস্যময় সৌরমুকুট! পূর্ণগ্রাসের এই বিশেষ অবস্থাকে বলে বলয়গ্রাস।

শুধু চোখ নয়, সজাগ রাখুন সব ইন্দ্রিয়ই।

পূর্ণগ্রাস গ্রহণের দৃশ্য উপভোগের সময় শুধু চোখ নয় চোখ-কান সবই সজাগ রাখুন। পূর্ণগ্রাস গ্রহণ দেখে মানুষই চমকায় এমন না। গোটা জীবজগতেই এর প্রভাব পড়ে। আলো ঝলমলে দিন দুপুরে যদি হঠাৎ আঁধার নেমে আসে তাহলে গোটা প্রাণীজগতই চমকে উঠবে তাতে সন্দেহ কি? ক্ষণিকের জন্য হলেও তাদের মধ্যে দেখা যাবে হতচকিত ভাব। সজাগ থাকলে লক্ষ্য করা যায় সেটা। সূর্য প্রায় পুরোপুরি চাঁদের আড়ালে মুখ লুকোবার মিনিট খানেক আগেই আলো বেশ কমে আসে। পূর্ণগ্রাসের সময় তো প্রায় পূর্ণিমার রাতের মত ধোঁয়াটে আলোর মেঘের মধ্যে ডুবে যাবে চারপাশ। তাই দেখে পাখীরা চঞ্চল হয়ে উঠবে। তাদের কিচির মিচির আর কাকের ডাকে মুখর হয়ে উঠবে চারপাশ। রোজ সন্ধ্যের মুখে যেমনটি হয়। এদের জীবনচক্র বাঁধা দিনরাত্রির আবর্তনের সাথে। ফলে দিনের মাঝে হঠাৎ আঁধার নেমে এলে তো চমকাবেই।

আরেকটি বিষয়ও লক্ষ্যণীয়। সূর্যগ্রহণ দেখতে তো খোলা আকাশের নীচেই অপেক্ষা করতে হবে। মাথায় সূর্য। একটু একটু করে আড়াল হবে সে। এই আলো থেকে অন্ধকার হওয়ার পর্বে বাইরের তাপমাত্রারও হেরফের হয়। সজাগ থাকলে টের পাওয়া যায়।

কোথা থেকে দেখবেন

সূর্যকে আড়াল করে দাঁড়ানোর জন্য চাঁদের পেছনের ছায়ার শঙ্কুটি পৃথিবী পৃষ্ঠের যে পথ ছুঁয়ে যাবে তার যেকোন স্থান থেকে পূর্ণগ্রাস গ্রহণ দেখা যায়। এই পথটিকে যদি ছায়াপথ বলি তাহলে পৃথিবীপৃষ্ঠে গোটা পথ জুড়ে ছায়া পথটি সমান চওড়া নয়। এবং পৃথিবী

পৃষ্ঠে পথের সর্বত্র ছায়ার গতিবেগও সমান নয়। সেজন্য পূর্ণগ্রাসের স্থায়িত্ব সমান নয়। অনেক কিছুর ওপর এসব নির্ভর করে। তবে ছায়াপথের মাঝ বরাবর রেখার ওপর যে কোন স্থান হল গ্রহণ দেখার পক্ষে আদর্শ।

পশ্চিমবঙ্গে পশ্চিম সীমান্ত থেকে দক্ষিণবঙ্গ অবধি বিস্তৃত এই ছায়াপথটি মোটামুটি 54 থেকে 56 কিলোমিটার চওড়া হবে এবার। এই পথটি পশ্চিমবঙ্গের একটি বড় ম্যাপের ওপর এঁকে নিলে কোথায় গিয়ে দেখা সুবিধেজনক তা নির্ণয় করা যেতে পারে। কিভাবে পথটি বার করবেন মোটামুটি একটা আন্দাজ দেওয়া যায়।

পশ্চিমবঙ্গের একটি বড় ম্যাপ নিতে হবে। এবার তার পশ্চিম সীমান্তে পুরুলিয়া জেলার ঝলদায় একটা বিন্দু নেওয়া হল। অন্য দিকে দক্ষিণবঙ্গের জয়নগর-মজিলপুরের রেললাইন বরাবর একটু নীচের দিকে একটি বিন্দু নেওয়া হল। এবার এই বিন্দুদুটি দিয়ে একটি সরলরেখা টানলে মোটামুটি ছায়াপথের মাঝবরাবর রেখাটি পাওয়া যাবে। রেখাটি দক্ষিণবঙ্গের ফলতা এবং মেদিনীপুরের কোলাঘাটের সামান্য একটু ওপর দিয়ে যাবে। এই রেখাটির উত্তরে বা দক্ষিণে সাতাশ কিলোমিটারের মধ্যে যে কোন স্থানে দাঁড়িয়েই ভালভাবে পূর্ণগ্রাস দেখা যাবে। শুধু মনে রাখতে হবে এই মাঝবরাবর রেখা থেকে যত দূরে যাবেন পূর্ণগ্রাস গ্রহণ দেখা যাবে খানিক কম সময় ধরে। ধরুন যদি ওই মধ্য রেখা থেকে তের-চোদ্দ কিলোমিটার উত্তরে বা দক্ষিণে কোন স্থানে দাঁড়িয়ে গ্রহণ দেখেন তো সেখানকার মধ্যরেখার 86-87 শতাংশ সময় ধরে পূর্ণগ্রাস দেখতে পাবেন। আর যদি ধরুন 21-22 কিলোমিটার দূর থেকে দেখেন তো 66 শতাংশ সময় ধরে দেখবেন।

পূর্ণগ্রাস গ্রহণ দেখার স্থান নির্বাচনের জন্য কয়েকটি বিষয়ের ওপর নজর দিলে ভাল হয়। যেমন, একটু উঁচু জায়গা। জায়গাটা একেবারে শহরের ওপর না হয়ে একটু শান্ত নির্জন জায়গা। জায়গাটির পুবে এবং পশ্চিমে যদি খোলা প্রান্তর থাকে।

কি কি দেখব

পূর্ণগ্রাসের সময় খুব বেশী নয়, আগেই বলেছি। ফলে কি কি দ্রষ্টব্য সে সম্পর্কে আগাম ধারণা থাকলে ভাল হয়।

সূর্য যখন চাঁদের আড়ালে ডুবু ডুবু, দেখা যাবে চারপাশে আলো বেশ কমে এসেছে। এই অবস্থায় খালি চোখেই সূর্যের দিকে তাকানো যায়। দেখা যাবে যেখান দিয়ে সূর্য চাঁদের আড়ালে ডুবে গেল সেইখান থেকে কতগুলো আলোক বিন্দু কুচকুচে কালো চাঁদের ধার ঘেঁষে ফুটে উঠেছে। ঠিক যেন একখানা মুক্তোর মালা। এই ঘটনার ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন একজন ইংরেজ জ্যোতির্বিদ। নাম ফ্রান্সিস বেইলী। পরবর্তীকালে তাঁরই নামে এর নাম হয়েছে 'বেইলীজ বিড্‌স্'। চাঁদের ওপরটা মসৃণ নয়। খানাখন্দ ভর্তি। সূর্য তার আড়ালে হারিয়ে যাবার সময় ওই খানাখন্দের ফোঁকর দিয়ে ছড়িয়ে দেয় যে বিন্দু বিন্দু সাদা আলো তাই দিয়ে তৈরী এই আলোকমালা।

খুব সামান্য সময়ের জন্যই এই আলোকমালা দেখা যাবে। পর মুহূর্তেই কালো চাঁদের আড়াল থেকে ছিট্‌কে বেরোবে রাশি রাশি আলোর ছটা। আর কালো চাঁদের চারপাশ ঘিরে ফুটে উঠবে বেগুনী আলোর আভা। আকাশের হালকা অন্ধকারের বুকে যেন গলে গলে পড়ছে সেই ধূসর আলো।

সময় বড়ই অল্প। এক ফাঁকে চারপাশের আকাশে একবার চোখ বুলিয়ে নিন। দেখবেন রাতের প্রহরীদের কেউ কেউ উঁকি দিয়েছে আকাশে। যার মধ্যে আছে বেশ কিছু উজ্জ্বল নক্ষত্র এবং দু' একটি গ্রহ। পারলে চিনে রাখুন এদের। সুযোগ মত বলতে পারবেন দিনের আকাশে দেখেছেন রাতের তারাদের।

অচিরেই আলোর আভাটি অন্তর্নিহিত হবে। চাঁদের বিপরীত ধার ঘেঁষে উঁকি দেবে শুরুর মত আলোর মালা। তথা 'বেইলীজ বীড্‌স্'। এবং চাঁদের আড়াল থেকে যেখান দিয়ে সূর্যের উজ্জ্বল অংশটি মুখ বাড়াবে সেখানে কালো চাঁদের পিঠের ওপর থেকে দেখা যাবে তীব্র একটি আলোর বিন্দু। যেন শত শত নক্ষত্রকে এক বিন্দুতে জড়ো করা। তার দুপাশে চাঁদের পিঠ ঘেঁষে ক্ষীণ আলোর রেখা। কল্পনা করা হয়েছে অংশটির ওপর যেন একখানি জ্বলজ্বলে হীরের খণ্ড।

তাই নাম দেওয়া হয়েছে 'হীরের আংটি' বা 'ডায়মণ্ড রিং'। পূর্ণগ্রাস সূর্য গ্রহণের অন্তিম দৃশ্য এটি।

সূর্য এবার কাস্তের ফালির আকার নিয়ে বেরিয়ে আসবে চাঁদের আড়াল থেকে। অন্তর্হিত হবে ধূসর অন্ধকার। ক্রমে আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে চারধার।

যেখানে দাঁড়িয়ে দেখছেন তার পশ্চিম দিকে যদি খোলা প্রান্তর থাকে তো একটি জিনিস লক্ষ্য করা যাবে। পূর্ণগ্রাসের প্রাক্‌কালে চাঁদের ছায়াটি দেখা যাবে ছুটে আসছে পশ্চিম দিক থেকে। কাছে এলে দেখা যাবে সেটা কাঁপা কাঁপা রেখার সমষ্টি। আশ-পাশের সাদা দেওয়ালে বা মাটিতে বিছিয়ে রাখা কাপড়ে মুহূর্তের জন্য দেখা যাবে সেই ছায়ার রেখা। এর নাম 'স্যাডো ব্যাণ্ডস'। পৃথিবীর বায়ুস্তরের জন্য এমন আকার নিয়েছে।

সাবধানবাণী

এমনি সময় কেউই খালি চোখে সূর্যের দিকে তাকাতে যান না। আসলে তাকানো যায়ই না। তাই তাকানোর প্রশ্ন নেই। কিন্তু সূর্য-গ্রহণ দেখার উৎসাহে তাকাতেই হয়। কিন্তু খালি চোখে সূর্যের দিকে তাকানো বিপজ্জনক। সাধারণ গগলস চোখে দিয়েও তাকানো ঠিক নয়। এজন্য ফটোগ্রাফের কালো ফিল্ম ব্যবহার করা যায়। একখানা নয়। দুখানা ফিল্ম একত্র করে তার মধ্য দিয়ে সূর্যকে দেখা মোটামুটি নিরাপদ। তবে আংশিক গ্রহণের সময় সূর্যের দিকে তাকানোর খুব একটা প্রয়োজনও নেই। পূর্ণগ্রাসের সময় আর চোখের জন্য কোন আড়াল প্রয়োজন নেই। খালি চোখেই দেখা যাবে। এবং খালি চোখেই দেখতে হবে।

আরেকটি আশঙ্কার কথা

একটি জিনিষ খেয়াল রাখতে হবে। এত আশা করে গ্রহণ দেখার জন্য প্রস্তুত হলেও সব কিছু নির্ভর করছে আবহাওয়ার ওপর। তবে তারিখটা অক্টোবর মাসের শেষ বলেই ভরসার কথা। আশা করা যায় আকাশ পরিষ্কারই থাকবে। তবে চরম মুহূর্তটিতে একখণ্ড মেঘ এসে যদি সূর্যকে আড়াল করে দাঁড়ায় তো সব পণ্ড!

মেঘই শুধু বাধা নয়

শুধু মেঘ নয়—পুরনো সংস্কারও গ্রহণ দেখায় বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে। যুগ যুগ সঞ্চিত বহু সংস্কার এখনও আমাদের চেতনাকে আচ্ছন্ন করে আছে। সূর্যগ্রহণকে কেন্দ্র করে নানান অমঙ্গল-চিন্তা তার একটি! পৃথিবীর সব দেশেই আছে এ নিয়ে সংস্কার। চালু আছে নানান কল্পকাহিনী। সব দেশেই মূল সুরটি এক। গ্রহণ হল অমঙ্গলের প্রতীক।

তবে সব দেশের মানুষই বুঝতে শুরু করেছে—এসব নিছকই কল্পনা। কারণ মানুষ এখন জানে গ্রহণ কেন হয়। কিভাবে হয়। জেনেছে এর সাথে মানুষের মঙ্গল-অমঙ্গল জড়িত নেই। বরং বহু জ্যোতির্বিজ্ঞানী এখন পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করেন। পৃথিবীর যেখান থেকে পূর্ণগ্রাস গ্রহণ দেখা যায়, ছুটে যান সেখানে। কারণ সূর্য সম্পর্কে কিছু কিছু গবেষণার জন্য এটিই প্রকৃষ্ট মুহূর্ত। সাধারণ মানুষের কাছেও এটা একটা সুযোগ। মনোরম একটি প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখার। তাই গ্রহণের নামে অযথা আতঙ্কিত না হয়ে এবং অর্থহীন আচার অনুষ্ঠান পালনে ব্যস্ত না থেকে সুযোগ থাকলে পরিবারের সকলে মিলে প্রাকৃতিক এই দৃশ্যটি দেখার চেষ্টা করুন। সারা জীবনের সঞ্চয় হয়ে থাকবে এর স্মৃতি। ☐ রবীন চক্রবর্তী

পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ দেখতে আসুন! কিছু জানার থাকলে উত্তর দেবার জন্য উপস্থিত থাকবেন বিশিষ্ট জ্যোতির্বিজ্ঞানী অমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়।

24শে অক্টোবর 1995 সকাল ছ'টা থেকে বেলা এগারোটা ☐ পূর্ণগ্রাসের সময় সকাল 8:48:56 থেকে 8:50:09

স্থান ঃ গাববেড়িয়া মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, গাববেড়িয়া, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা

পথনির্দেশ ঃ শেয়ালদা থেকে লক্ষ্মীকান্তপুর স্টেশনে পৌঁছে সাইকেল রিক্সা বা ভ্যান

বিষয়ঃ পরিবেশ (দ্বিতীয় পর্ব)

এক

দৈনন্দিন জীবন-জীবিকার উর্দ্ধে পরিবেশ কোন বিমূর্ত বিষয় নয়। মানুষের সৃষ্টি-স্থিতি-কৃতি সবই পরিবেশ-নির্ভর। লয়ও বোধহয় পরিবেশ ধ্বংসে। সমাজ-সংস্কৃতি-জীবিকা সবকিছুই আজ পরিবেশ দূষণের প্রচ্ছায়া উপচ্ছায়া কবলিত। বিজ্ঞান-কারিগরী পরিবেশ দূষণের হাতিয়ার হিসেবে কাজ করছে। দূষণরোধেও বিজ্ঞান-কারিগরীকেই হাতিয়ার হয়ে উঠতে হবে ঠিকই, কিন্তু পরিবেশমুখী মানবিক একটি দৃষ্টিভঙ্গীর অভাবে তা সম্ভব হবে না বলেই মনে হয়। এমনই এক দৃষ্টিভঙ্গীর অনুসন্ধানের উদ্যোগ—বিষয়ঃ পরিবেশ।

যে কেউ এবিভাগে প্রকাশের জন্য লেখা পাঠাতে পারেন। মনোনীত লেখা পরিকল্পনা মাফিক যথাস্থানে প্রকাশিত হবে। কমবেশী দেড় হাজার শব্দের মধ্যে লেখা পাঠান। চিঠিপত্রে মতামত জানান। সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর উপর খবর, টীকা, সমীক্ষাও গৃহীত হবে।—সঃ মঃ

দূষণের মাপ ও মাত্রা

প্রথম অংশ

গরিবী-তন্ত্র হঠিয়ে ভারত পেতে চায় ধনতন্ত্র,
আমাদের সেটা অঢেল রয়েছে দেবো তারই কিছু অংশ,
উন্নতি আর আধুনিকতার মন-কাড়ানিয়া মন্ত্র
আনুষঙ্গিক আঙ্গিকে তার দু-চার ডজন কংস!
অনাবশ্যক অনিবার্যতায় পরিবেশে কিছু বিঘ্ন
সেটা যাই হোক, সংশোধনেরও আছে জব্বর যন্ত্র!
প্রশ্নের কোন অবকাশ নেই জবাব ডলার তীক্ষ্ম—
ক্রন্দসী যদি না-ই কাঁদে, কিসে রূপসীর অবতংস?

—বাড়ীতে একটা টিউবওয়েল বসিয়েছি জলটা একটু টেষ্ট করে দেখতে চাই। কোথায় করা যায়?

—আমাদের জলটা এত 'ভারী' আর 'মোটা' কী বলব। ধরে রেখে দিলে কালচে ঘোলা হয়ে ওঠে। লোহা খুব বেশী, ডাল সেদ্ধ হয় না। কৌষ্ঠ-কাঠিন্য লেগেই আছে, কী করা যায়?

—মাঝে মাঝে কর্পোরেশন যে জল দেয় তাতে ক্লোরিনের উৎকট গন্ধ। ক্লোরিনটা এভাবে পেটে যাওয়া খারাপ না তো?

—পাশের পাড়ার কলের জলে আর্সেনিক পাওয়া গেছে। আমাদের পাড়ার জলটাও টেষ্ট করাতে চাই। কোথায় করানো যায়?

—এবার গ্রীষ্মে আমাদের গ্রামের সব টিউবওয়েল শুকিয়ে গেছিল, বহু পুরনো এক কুয়ো আশেপাশের পাঁচটা গ্রামের প্রয়োজন মেটাতো কোনরকমে, এবার সেটাও শুকিয়ে গেল,—বছর বছর এ সমস্যা বাড়ছে, সামনের গ্রীষ্মে আমরা খাবার জলটুকু পাবো তো? পানীয় জল নিয়ে এমনি কত না

সমস্যা মানুষের। অন্যদেরও আছে অনা রকম সমস্যা! চাষী চাষের জল পাচ্ছে না। সেচ করার মত জলও ভূগর্ভে আর মিলছে না, কিংবা গভীর নলকূপের জলে চাষ করা কঠিন হয়ে উঠেছে। উপরের মাটিতে লবণ অনেক বেড়ে গেছে। ছোট কারখানার উপর সরকারী নোটিশ পড়েছে—পাশের খালে বা জমিতে আর কারখানার জল ফেলা যাবে না। শোধন করতে হবে। হাসপাতালের জল ছড়াচ্ছে জণ্ডিস। এমনকি ডাক্তারবাবুও মারা যাচ্ছেন সংক্রামক জণ্ডিসে।

হাজারো সমস্যা জল নিয়ে। জল-সমস্যা নেই এমন মানুষ বিরল। কি কয়ি, কোথা যাই অবস্থা সকলেরই। আশু সমাধান দরকার, দরকার ভবিষ্যতের আশ্বাসও।

জলের সমস্যার সমাধান কিন্তু 'জলের মত পরিষ্কার' নয় মোটেই। তবে সমাধানের কথা ভাবনা বা আলোচনার আগে দূষণের ধরণ, মাপ ও মাত্রা সম্পর্কে একটু জানা-বোঝা দরকার।

* * *

জলের দোষ-গুণ এবং দূষণ মাত্রা নির্দেশক প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি এখানে সংক্ষেপে আলোচনা করা হচ্ছে।

1. পি. এইচ. (PH) : পি. এইচ. হল জলের অম্লত্ব বা ক্ষারত্বের সূচক। সাধারণভাবে বিশুদ্ধ জল হল প্রশম অর্থাৎ না-অম্ল, না-ক্ষার। পি. এইচ. স্কেলে তার মান 7। পি. এইচের মান 7-এর কম হলে তা অম্লত্বের এবং 7 এর বেশী হলে ক্ষারত্বের পরিচায়ক। তবে পানীয় জলের ক্ষেত্রে সামান্য অম্লত্ব গ্রহণযোগ্য (6.5—7)। পি. এইচ. মাপক যন্ত্রে সহজেই এটি মাপা যায়। পি. এইচের ধারণা ও স্কেলটি লঘু অ্যাসিড বা ক্ষারীয় দ্রবণের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। পি. এইচের সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ মান যথাক্রমে O এবং 14.

জলে দ্রবীভূত অ্যাসিড বা ক্ষার, লবণ ও গ্যাস জলের অম্লত্ব-ক্ষারত্বের অবস্থা নির্ধারণ করে।

2. মোট ভাসমান কঠিন পদার্থ (Total Suspended Solids TSS) : সহজে থিতিয়ে পড়ে না এবং জলে দ্রবীভূতও হয় না এমন ভাসমান সূক্ষ্ম কঠিনপদার্থের কণার জন্যই জল ঘোলা দেখায়। সাধারণভাবে জল ঘোলার কারণ হ'লো ভাসমান ধুলো বালি-কাদা। কিন্তু বিশেষ কিছু কিছু ক্ষেত্রে অন্যপ্রকার অদ্রাব্য রাসায়নিক পদার্থও জলকে ঘোলা করতে পারে। জলে দ্রবীভূত কোন কোন পদার্থ বাতাসের সংস্পর্শে এসে অদ্রাব্য কঠিন পদার্থ সৃষ্টি করলে পরিষ্কার জল ঘোলা দেখাতে পারে। জলের মোট ভাসমান কঠিন পদার্থ (TSS) মাপবার একটি সরল পদ্ধতি হ'ল—নির্দিষ্ট ওজন বা আয়তনের জলকে সূক্ষ্ম ছিদ্রের ছাঁকনী কাগজে ছেঁকে শুকিয়ে ওজন মেপে নেওয়া।

3. মোট দ্রবীভূত কঠিন পদার্থ (Total Dissolved Solids—TDS) : এমনকি স্বচ্ছ বর্ণহীন জলও ক্বচিৎ বিশুদ্ধ। কিছু না কিছু দ্রবীভূত কঠিন পদার্থ প্রাকৃতিক সব জলেই থাকে। প্রকৃতি অনুসারে সেগুলি মূলতঃ দু-রকমের :

জৈব পদার্থ (চিনি, শ্বেতসার, প্রোটিন ইত্যাদি) এবং অজৈব পদার্থ (নুন, ধাতব ক্লোরাইড, সালফেট, কার্বনেট, বাইকার্বনেট ইত্যাদি)

মোট দ্রবীভূত কঠিন পদার্থের মোটামুটি আন্দাজ বা মাপ জানার সরল উপায় হ'ল নির্দিষ্ট ওজনের জলকে ধীরে ধীরে শুকিয়ে ফেলে পড়ে থাকা কঠিন পদার্থের ওজন মেপে নেওয়া।

জলের বিদ্যুৎ-পরিবাহিতা দ্রবীভূত অজৈব-লবনের মাত্রার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ে। তাই বিদ্যুৎ-পরিবাহিতা মেপে অজৈব-লবণের পরিমাণ আন্দাজ করা হয়।

ভাসমান কঠিন পদার্থ এবং দ্রবীভূত কঠিন পদার্থের যত ভাগ ওজন প্রতি দশ লক্ষ ভাগ ওজনের জলে বর্তমান থাকে তা মাপা হয়। এই এককের নাম পি পি এম [p p m—পার্টস পার মিলিয়ন পার্টস)] যেমন কোন জলে মোট দ্রবীভূত কঠিন পদার্থের পরিমাণ 200 p p m বলতে বোঝাবে দশ লক্ষ গ্রাম (এক হাজার লিটার) জলে 200 গ্রাম কঠিন দ্রবীভূত আছে (অথবা 200 মিলিগ্রাম প্রতি লিটারে।)

4. জলে দ্রবীভূত অক্সিজেন Dissolved Oxygen—DO : বাতাসের অক্সিজেন অল্প পরিমাণে জলে দ্রবীভূত থাকে এবং তা জলজ প্রাণী-উদ্ভিদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। 25 ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রায়

(যা আমাদের দেশের গড় তাপমাত্রা বলে ধরা যায়) অক্সিজেনের সর্বোচ্চ দ্রাব্যতা 8 মিলিগ্রাম প্রতি লিটারে (8 p p m)। তাপমাত্রা বাড়লে, যেমন গ্রীষ্মকালে, দ্রাব্যতা কমে যায়, আবার তাপমাত্রা কমলে দ্রাব্যতা বেড়ে যায়; বরফ-ঠাণ্ডা অবস্থায় (0°C) অক্সিজেনের দ্রাব্যতা হয় 14 p p m জলে অন্যান্য পদার্থ দ্রবীভূত থাকলেও অক্সিজেনের দ্রাব্যতা কমে যায়। কাজেই DO মাত্রা পরোক্ষভাবে জলে দূষণের নির্দেশক।

রাসায়নিক পদ্ধতিই দ্রবীভূত অক্সিজেন মাপার শ্রেষ্ঠ পদ্ধতি। কিন্তু আজকাল নানারকম DO তড়িদ্বারের (electrode) বহুল প্রচলন হয়েছে। পি. এইচ. মাপার মতই তা হয়ে উঠেছে সহজ ও ব্যাপক। যত্রতত্র তড়িদ্বার বয়ে নিয়ে গিয়ে DO মেপে ফেলা যায়।

5. **জলে দ্রবীভূত পচনযোগ্য জৈব পদার্থ** (Biochemical Oxygen Demand—BOD): চিনি, শ্বেতসার (স্টার্চ), প্রোটিন, তেল, চর্বি, সাবান, সুতো, কাগজ ইত্যাদি বহু জৈব পদার্থই অপেক্ষাকৃত সহজেই জলের মধ্যে থাকা ব্যাকটেরিয়া দ্বারা খাদ্য হিসেবে গৃহীত হয় এবং ব্যাকটেরিয়ার কোষে অক্সিজেন দ্বারা দহণ হয়ে জল, কার্বন ডাই-অক্সাইড ইত্যাদি ছোট ছোট অণুতে পরিণত হয়ে প্রকৃতিতে মিশে যায়। সাধারণভাবে বলতে গেলে এরই নাম পচন। জলে দ্রবীভূত অক্সিজেন এই দহন বা ভাঙনের কাজের জন্য ব্যবহৃত হয়। দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ কমে গেলে বাতাস থেকে আরও অক্সিজেন দ্রবীভূত হয় এবং পচন তথা শোধণ' প্রক্রিয়াটি অব্যাহত রাখতে সাহায্য করে। যদি যথেষ্ট সংখ্যক ব্যাকটেরিয়ার উপস্থিতি নিশ্চিত করা যায়, তবে কোন নির্দিষ্ট তাপমাত্রায়, পচন তথা শোধণ প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করার জন্য অক্সিজেনের চাহিদার পরিমাণ হবে ঐ জলে দ্রবীভূত জৈব পদার্থের মাত্রার উপর নির্ভরশীল। অন্য কথায়, পচনযোগ্য জৈব পদার্থ ও পচনক্রিয়ার জন্য প্রয়োজনীয় অক্সিজেনের পরিমাণ সমানুপাতিক। এই নীতির ভিত্তিতেই সাধারণত 20°C তাপমাত্রায় অক্সিজেন-সম্পৃক্ত জলে 5 দিন ধরে 'পচনে'র জন্য যে অক্সিজেম খরচ হয় তা পরিমাপ করে DO-র সাহায্যে হিসেব করে নির্ধারণ করা হয় 'BOD'-র মাপ। এরও একক পিপিম তথা মিলিগ্রাম প্রতি লিটারে। মোটামুটি অ-দূষিত জলের BOD-র মান 30 ppm ধরা যায়। এর অর্থ হল সাধারণ ব্যবহার্য জলে দ্রবীভূত জৈব পদার্থের শোধনের জন্য প্রতি লিটারে 5 দিনে 30 mg অক্সিজেন প্রয়োজন। শহুরে গৃহস্থালীর বর্জ্য জলের গড় BOD 100 ppm. মতো ধরা যায়।

পচনের এই প্রক্রিয়া অত্যন্ত ধীর গতিতে চলে। 5 দিনে 70—80 শতাংশের পচন হলেও একেবারে সম্পূর্ণ হতে 20—25 দিন সময় লেগে যায়। সমস্যা হ'ল। বেশী রকম দূষিত জলে শুধু যে দ্রবীভূত অক্সিজেন কম থাকে (ফলে জলের প্রাণী ও উদ্ভিদের জীবনধারণের অনুপযোগী) তাই নয়, পচনের জন্য ক্রমাগত প্রয়োজনীয় অক্সিজেন বাতাস থেকে দ্রবণে টেনে নেবার ক্ষমতা তথা হারও এর কম হয় ফলে পচন তথা শোধন প্রক্রিয়াটি চলাই দুরূহ হয়ে পড়ে।

সাধারণভাবে BOD মাপার জন্য 5 দিন সময়ই লাগে। তবে বিশেষ ক্ষেত্রে কম সময়ের পরীক্ষার ফলও কাজে লাগানো সম্ভব।

6. **রাসায়নিক অক্সিজেন চাহিদা** (Chemical Oxygen Demand—COD): পটাশিয়াম ডাইক্রোমেটের মত শক্তিশালী জারক পদার্থের দ্বারা পচনযোগ্য এবং সহজে পচন হয় না—এমন সমস্ত জৈব পদার্থকে অপেক্ষাকৃত স্বল্প সময়েই (পরীক্ষাগারে) জল ও কার্বন ডাই-অক্সাইড ইত্যাদিতে জারিত করে ফেলার জন্য যে পরিমাণ অক্সিজেনের প্রয়োজন পড়ে তাকেই বলা হয় COD. একেও প্রকাশ করা হয় ppm. তথা মিগ্রা প্রতি লিটার এককে। সাধারণত BOD'র চেয়ে COD'র মান বেশী হয়।

কোন জলের BOD 100 মিগ্রা / লিটার এবং COD 120 মিগ্রা / লিটার হলে বলা যায় যে ঐ জলে প্রতি লিটারে 20 mg. অক্সিজেনের চাহিদা সম্পন্ন এমন জৈব যৌগ আছে যার সহজে পচন হয় না (Non-biodegradable)। অধিকাংশ ডিটারজেন্ট, প্লাস্টিক, কিছু কিছু কীটনাশক,

কার্বলিক অ্যাসিড তথা ফেনল জাতীয় যৌগ সাধারণ অবস্থায় সহজে পচে গিয়ে শোধিত হয় না।

7. বিষাক্ত পদার্থ (Toxic Substances): জৈব বা অজৈব নানা ধরনের বিষ বা বিষ-উৎস জলে মিশে থাকতে পারে। কীটনাশক, ফেনল জাতীয় যৌগ ইত্যাদি যেমন থাকতে পারে তেমনি থাকতে পারে সায়ানাইড বা ভারী ধাতু (যেমন পারদ, সীসা, ক্রোমিয়াম, কপার, ক্যাডমিয়াম, আর্সেনিক, সোনা, রূপা ইত্যাদি)। বিশেষ ক্ষেত্রে তেজস্ক্রিয়তা। বিশেষ বিশেষ পরীক্ষা দ্বারাই এদেরকে আলাদাভাবে চিহ্নিত ও পরিমাপ করতে হয় এবং ppm. তথা মিগ্রা / লিটারে প্রকাশ করা হয়।

বিষাক্ত পদার্থের উপস্থিতিতে ব্যাকটিরিয়া তথা জীবাণুর অস্তিত্ব ও বংশ বৃদ্ধি বিপন্ন হয়. তাই 'পচন' বিক্রিয়া সুষ্ঠুভাবে হতে পারে না। প্রকৃতিতেও তেমন বর্জ্য জলের 'শোধন' যেমন হ'তে চায় না BOD পরীক্ষার জন্যও তেমনি আগেই জলের নমুনার বিষমুক্তির ব্যবস্থা করতে হয়।

8. কলিফর্ম সংখ্যা (Colliform Count): জলে নানারকম জীবাণুই থাকে। পৃথকভাবে তাদের সনাক্ত করা এবং কোনো মুহূর্তে জলের মধ্যে তাদের সংখ্যাঘনত্ব মাপা—দুরূহ না হ'লেও বিশেষ ব্যবস্থা ও দক্ষতার দাবী করে। অথচ কলেরা, তথাকথিত 'আন্ত্রিক', আমাশয়, টাইফয়েড, প্যারা-টাইফয়েড, টিউবারকুলোসিস, গোল-কৃমি, ফিতাকৃমি, মাল্টা ফিভার, খাদ্যের বিষক্রিয়া ইত্যাদি রোগের ব্যাকটিরিয়া জীবাণু এবং জন্ডিস, পোলিও ইত্যাদির ভাইরাস জলের মাধ্যমেই বিস্তার লাভ করে এবং মহামারীর রূপ নিতে পারে। কোন জলের সম্ভাব্য রোগ-জীবাণুর উপস্থিতি আন্দাজ করার জন্য একটি সহজ পরোক্ষ ব্যবস্থা বহুল প্রচলিত। এই পরীক্ষার নামই হ'ল কলিফর্ম সংখ্যা নিরূপণ পরীক্ষা।

মানবদেহের অন্ত্রে সদা ক্রিয়াশীল একপ্রকার দণ্ডাকৃতি ক্ষুদ্র ব্যাকটিরিয়ার নাম কলিফর্ম। এরা অবশ্য উপকারী ব্যাকটিরিয়া। প্রতিদিন একজন মানুষের মলের সঙ্গে এক থেকে চার লক্ষ কোটি (100—400 বিলিয়ন বা $100—400 \times 10^9$) কলিফর্ম ব্যাকটিরিয়া নির্গত হয়। আবার কলেরা জন্ডিস ইত্যাদি রোগাক্রান্ত মানুষের মলের সঙ্গে কোটি কোটি রোগ জীবাণুও নির্গত হবে। পানীয় জলের উৎসের সঙ্গে কোনভাবে পয়ঃ-প্রণালীর সংযোগ ঘটলে কলিফর্ম ব্যাকটিরিয়ার সঙ্গে রোগজীবাণুও এসে যাবে এবং তাদের উভয়েরই বংশ বৃদ্ধি ঘটতে থাকবে। তাই এটা ধরে নেওয়া যুক্তিযুক্ত যে কলিফর্ম ব্যাকটিরিয়ার সংখ্যাঘনত্ব যত বেশী হবে রোগ-জীবাণুর উপস্থিতির সম্ভাবনাও ততই প্রবল হবে।

কলিফর্ম ব্যাকটিরিয়ার সংখ্যাঘনত্ব মাপা অপেক্ষাকৃত সহজ। প্রথমে কয়েক ফোঁটা জলকে একটি বিশেষ কাচের প্লেটে বিশেষভাবে তৈরী ল্যাক-টোজ দ্রবণের সঙ্গে মিশিয়ে ঢেকে রাখ পাত্রটি 25°C তাপমাত্রায় 24 ঘণ্টা রাখা হয়। যদি স্বচ্ছ বর্ণহীন প্লেটের দ্রবণ ঘোলাটে সাদা হয়ে যায় তবে তা কলিফর্ম জীবাণুর উপস্থিতি নির্দেশ করে। এটিকে বলে পূর্বানুমান পরীক্ষা। কলিফর্ম ব্যাকটিরিয়ার উপস্থিতি ধরা পড়লে ঘোলাটে ল্যাক-টোজ দ্রবণের দু এক ফোঁটা তুলে নিয়ে আর একটি বিশেষভাবে তৈরী জেলীখাদ্যের কাচ পাত্রে সন্তর্পণে মিশিয়ে দিয়ে, ঢাকা পাত্র 24 ঘণ্টা ধরে 25°C-এ রাখা হয়। এবং তাতে সাদা সাদা বিন্দুর সংখ্যা গুণে নেওয়া হয়। সাধারণত খালি চোখেই এই বিন্দু তথা ব্যাকটিরিয়ার বিচ্ছিন্ন উপনিবেশ গুলি দেখা যায় এবং গোনা যায়। প্রথমে নেওয়া জলের পরিমাণ থেকে সহজেই হিসাব কষে বের করা হয় প্রতি মিলিলিটার বা প্রতি 100 মিলি-লিটার জলে কত সংখ্যক কলিফর্ম জীবাণু ছিল।

জলের উৎস এবং ব্যবহারের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে উপরে বর্ণিত বৈশিষ্ট্যগুলির একটি, কয়েকটি অথবা সবগুলি পর্যবেক্ষণ ও পরিমাপ করা হয়ে থাকে।

সবশেষে উল্লেখ্য যে আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য মৌলিক যন্ত্রপাতি যাদের সাহায্যে অনেক সময়েই জলের বর্ণ, গন্ধ, উষ্ণতা ও ঘোলাভাব পরীক্ষা করে জলদূষণের প্রাথমিক ধারণা পাওয়া যায়।

☐ রবীন মজুমদার

সুপ্রীম কোর্টের রায় এবং অসহায় ট্রেড ইউনিয়ন

সুপ্রীম কোর্ট পশ্চিমবঙ্গের তিরিশটি কারখানা বন্ধ করে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন গত ফেব্রুয়ারী মাসে। দূষণ-নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা না নেওয়ার অপরাধে। এর আগের বছর নভেম্বর মাসেই কোর্ট নির্দেশ দিয়েছিলেন তিন মাসের মধ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে। নইলে কারখানা বন্ধের আদেশ দেবেন। মালিক এবং কারখানা পরিচালন কর্তৃপক্ষরা স্বীকার করেছিলেন যা যা দরকার করবেন। কিন্তু করেননি। অথবা যা করেছেন যথেষ্ট নয়। অন্ততঃ কোর্ট-নিযুক্ত বিশেষজ্ঞরা তাই মনে করেছেন। ফলে এই চরম রায়।

এই তিরিশটি কারখানার মধ্যে সরকারী সংস্থাও আছে। কোর্টের নির্দেশ পেয়ে অবাক হয়েছেন এমন ভাব দেখিয়েছেন সকলেই। যেন এমনটা যে হতে পারে জানতেন না। সবাই জানে কোর্ট আগেও এমন রায় দিয়েছেন অন্যান্য রাজ্যের ক্ষেত্রে। এ রাজ্যে আরও অনেক শিল্প সংস্থাই এমন পরিণতির মুখে দাঁড়িয়ে আজ। হাওড়ার বহু ঢালাই কারখানায় নির্দেশ দেওয়া হয়েছে দূষণ নিরোধক ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য। আগামী ডিসেম্বর মাসের মধ্যে। নইলে একই নির্দেশ দেওয়া হবে। বলে দিয়েছেন কোর্ট।

'নাগরিক মঞ্চ'-এর লিফলেট থেকে

গঙ্গা দূষণ রোধ করতে '85 সালে কেন্দ্রীয় সরকার গঙ্গা অ্যাকশন প্ল্যান হাতে নেয়। তার পরের দু বছর কয়েকশ কোটি টাকা খরচ হলেও তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য কাজ চোখে না পড়ায় কানপুর শহরে চামড়ার ট্যানারীগুলোকে কেন্দ্র করে আইনজীবী-পরিবেশবিদ এম সি মেহতা কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে '87 সালে সুপ্রীম কোর্টে মামলা করেন। সেই মামলা আজ 'গ্যাঞ্জেস ম্যাটার' বলে পরিচিত।

এই গ্যাঞ্জেস ম্যাটারের আওতায় উত্তর প্রদেশের 1,100 ও বিহারের 150টি দূষণ সৃষ্টিকারী সংস্থা জড়িত হয়েছে গত আট বছরে। পশ্চিমবঙ্গে এই মুহূর্তে 73টি মিউনিসিপ্যালিটি, 9টি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র, 530টি ট্যানারী ও হাওড়া শহরের 127টি ফাউন্ড্রি ছাড়াও 252টি শিল্প সংস্থা দূষণের দায়ে অভিযুক্ত। এছাড়া আরো প্রায় 700টি শিল্প সংস্থা চিহ্নিত হয়ে আছে সারা পশ্চিমবঙ্গে, যদিও এখনও সেগুলো সরাসরি মামলার আওতাভুক্ত হয়নি। রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদও সেগুলি সম্পর্কে এখনও কোনো ব্যবস্থা নেয়নি।

গ্যাঞ্জেস ম্যাটার মামলায় জড়িত পশ্চিমবঙ্গের 30টি শিল্প সংস্থাকে সুপ্রীম কোর্ট বন্ধ করে দেবার আদেশ দিয়েছে গত 2রা ফেব্রুয়ারী '95। শিল্প উৎপাদন বন্ধ ও শ্রমিকের স্বার্থরক্ষা নিয়ে হঠাৎই নানান শোরগোল উঠেছে। রাজ্য সরকার প্রকাশ্য বক্তব্যে বলেছে শিল্প বন্ধের আদেশ যে হতে পারে তা সরকার জানত না। এ বিষয়ে খেয়াল রাখা দরকার যে গত '87 থেকে চলা এই মামলায় বিভিন্ন রাজ্যে নানান শিল্প সংস্থা বন্ধ হয়েছে সুপ্রীম কোর্টের আদেশে। পাশাপাশি, গত নভেম্বরে এক আদেশে সুপ্রীম কোর্ট স্পষ্ট জানিয়েছিল যে এই 30টি সংস্থা তিন মাসের মধ্যে দূষণ রোধের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা না নিতে পারলে সংস্থাগুলো 15 জানুয়ারীর পর বন্ধ করার আদেশ দেওয়া হবে। সেই সময়েই দূষণ পর্ষদের তরফ থেকে সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রীর দপ্তরে সেই আদেশের প্রতিলিপি পাঠানো হয়েছিল। ফলে সরকারের অন্ততঃ চমকে ওঠার মতন তেমন কোনো কারণ বোধ হয় নেই।

বন্ধের নোটিশ পেয়ে কারখানার পরিচালন কর্তৃপক্ষরা তৎপর হয়ে ওঠেন। শুরু হয়ে যায় ছোটাছুটি, তদ্বির। কোর্টের কাছে সময় চেয়ে আবেদন। মধ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করবেন বলে জানান।

ইতিমধ্যে কারখানার কর্তৃপক্ষ কি ব্যবস্থা নিয়েছেন জানা নেই। আদৌ নিয়েছেন কিনা জানি না। কিন্তু এবারেও যদি কোর্ট এদের কাজে সন্তুষ্ট না হন তো কি শাস্তি দেবেন কে জানে। তবে তিরিশটি কারখানা বন্ধ হওয়া মানে অন্ততঃ তিরিশ হাজার মানুষের নতুন করে বেকার হওয়া। এই বিপর্যয়ের জন্য দায়ী কে? নিশ্চয়ই সাধারণ শ্রমিক কর্মচারীরা নন। তাহলে যাদের অবহেলায় এই পরিণতি তাদের কি ধরা হবে? দেওয়া হবে শাস্তি? জানা নেই। এমন একটা অনিশ্চয় পরিস্থিতির মুখে দাঁড়িয়ে আছে এত-গুলো মানুষ! বাইরে যারা দাঁড়িয়ে তারা দর্শক। চেয়ে আছে কোর্টের দিকে। এ এক বিচিত্র অবস্থা!

কিন্তু কারখানা বন্ধ করে দেওয়াটা কি কোন সমাধান হল? অবশ্যই নয়। যে বিচারপতিরা এই রায় দিয়েছেন তারাও নিশ্চয়ই বোঝেন কথাটা। তবুও এই রায় দিয়েছেন। কেন দিয়েছেন ভেবে দেখা দরকার।

এই মামলা শুরু হয়েছে সাতাশী সালে। কানপুর সংলগ্ন ট্যানারী-গুলোকে কেন্দ্র করে। তারপর একে একে অন্যান্য রাজ্যের দূষণকারী সংস্থাগুলি এই মামলার আওতায় এসে পড়ে। এই দীর্ঘ কয়েক বছরের অভিজ্ঞতা হল সরকারী-বেসরকারী কোন কর্তৃপক্ষই দূষণ সমস্যায় প্রয়োজনীয় গুরুত্ব দিতে নারাজ। যাহোক করে আইন বাঁচিয়ে চলাই তাঁদের লক্ষ্য। এ জন্য দুর্নীতির আশ্রয় নিতেও পেছপা নন তারা। আশা যে এতগুলি মানুষের ভবিষ্যৎ যেখানে যুক্ত সেক্ষেত্রে পরিচালন কর্তৃপক্ষ এবং সরকার একটু নড়েচড়ে বসবেন।

তিরিশটি কারখানা নড়াতেই এই অবস্থা! আরও হাজার হাজার কল-কারখানা পড়ে রয়েছে। যারা অবিরাম ক্ষতি করে চলেছে মানুষ এবং পরিবেশের। তাদেরও কি একই উপায়ে নড়াতে হবে? তা'লে কতদিন লাগবে তাদের শুধু নড়াতেই!

গত মে মাসে সুপ্রীম কোর্টের এক আদেশে তিরিশটি কারখানার মধ্যে পনেরটি কারখানা বন্ধের আদেশ দেওয়া হয়েছে। এর আগে এপ্রিল মাসে আর এক আদেশবলে ইণ্ডিয়া জুট মিল (হাওড়া), এলায়েড রেসিন এণ্ড কেমিক্যালস্ (হাইড রোড), পি. ভি. কোঃ (দুর্গাপুর) এবং গেস্‌টেট্‌নার—এই চারটি কারখানার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হিসেবে পঁচিশ হাজার টাকা করে জরিমানা করা হয়েছে।

আর দেখেশুনে শুভবুদ্ধির উদয় হবে? সে গুড়ে বালি। অতীতে কখনও তেমনটা হয় নি। মুনাফা ছাড়া আর সব কিছুই বাহুল্য তাদের কাছে। যে সব কারখানার শ্রমিক কর্মচারী আজ এক আধটু সুযোগ সুবিধে পান তা মালিকের বদান্যতায় হয় নি। রীতিমত লড়াই করে আদায় করতে হয়েছে। কত কম ব্যয়ে কত বেশী লাভ'—এই যাদের লক্ষ্য তারা হঠাৎ 'পরিবেশের ক্ষতি—হেন অ্যাবস্ট্রাক্ট কারণে' (!) উপুড়হস্ত হবে আশা করা যায় না। করলে সেটা অর্বাচীনের আশা। তাহলে—?

এই তাহলের উত্তর একটাই। স্বেচ্ছায় এ কাজ করবেন না তারা। বাধ্য করতে হবে। বাধ্য কে করবেন? এই বাধ্য করার কাজ বাইরের লোকের দ্বারা সম্ভব নয়। আইন কিংবা প্রশাসনের দ্বারাও নয়। সেখানে সর্ষেতেই ভূত। সম্ভব একমাত্র কারখানা চত্বরে কাজ করছেন যাঁরা তাঁদের দ্বারাই। দূষণের যাবতীয় উৎস স্থলে তাঁরা কাজ করছেন। যন্ত্রণা ভোগ করছেন। হরেক ব্যাধিতে ভুগছেন। ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন সব থেকে বেশী। প্রাথমিকভাবে সরব হতে হবে তাদেরকেই। আর সকলে তাদের সঙ্গী হতে পারে।

দুর্ভাগ্যের বিষয় পরিবেশ দূষণ নিয়ে হাঁকাহাঁকির মধ্যে তাঁরা নেই। এর থেকে দূরে থাকাই পছন্দ করেন তারা। হাঁকাহাঁকি দোড়গোড়ায় এসে হাজির হলে শঙ্কিত বোধ করেন। আশেপাশে আন্দোলন গড়ে উঠলে অনেক সময় বিরোধিতাও করেন। সর্বদাই ভয় এই অছিলায় মালিক কারখানাই না বন্ধ করে দেন! এই আশঙ্কা থেকেই তারা সমস্ত শারীরিক কষ্ট এবং ক্ষতি মুখ বুজে সহ্য

করেন। পরিবেশ নিয়ে হৈচৈ হুজুগ মাত্র ভেবে মনকে প্রবোধ দেন।

স্থানিক বিচারে এই আশঙ্কা অমূলক নয়। অন্ততঃ ছোটখাট সংস্থার ক্ষেত্রে। শিল্প কারখানার মানচিত্রে যাদের সংখ্যাই বেশী। এক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনগুলির দায়িত্ব ছিল সর্বাধিক। তাঁরা উদ্যোগী হলে পরিস্থিতিটা অন্যরকম হতে পারত। পরিবেশ নিয়ে জটিল বিতর্কে ঢোকার দরকার ছিল না। তাঁরা তাঁদের এক্তিয়ারের মধ্যে থেকেই সক্রিয় হতে পারতেন। শ্রমিক কর্মচারীদের অসুস্থতা এবং পেশাগত ব্যধির বিষয়টি নিয়েই লড়াইয়ে নামতে পারতেন। পেশাগত অসুখবিসুখ নিয়ে প্রচুর গবেষণা হচ্ছে আজকাল। এই তথ্যভাণ্ডার তাদের হাতিয়ার হতে পারত। প্রত্যেকটি অসুস্থতার ঘটনার জন্য ক্ষতিপূরণ আদায়ের লড়াইয়ে নামতে পারতেন। এতেই কর্তৃপক্ষর টনক নড়ত। এক আধটু নড়ে চড়ে বসার চেষ্টা করত। দুঃখের বিষয় এই উদ্যোগ চোখে পড়েছে খুব কমই। কারখানা চত্বরের দুর্ঘটনাতেই আবদ্ধ থেকেছে তাঁদের দৃষ্টি!

তাঁদের এই উদাসীনতার সুযোগে আরেকটা ঘটনা ঘটে গেছে। কারখানা চত্বরের পরিবেশ সংরক্ষণের বিষয়টাই গৌণ হয়ে গেছে ক্রমে। পেশাগত অসুস্থতা এবং ব্যাধির বিষয়টি আড়ালে চলে গেছে। পরিবেশ দূষণের ভাবনাটি কারখানার চৌহদ্দি ছেড়ে আশ্রয় পেয়েছে বৃহত্তর সমাজের ক্ষেত্রে। কারখানার মধ্যেকার সমস্যা নিয়ে উদ্বেগ গেছে কমে। এখন তা সর্বসাধারণের সমস্যা হিসেবে দেখা দিয়েছে। যেহেতু সবার সমস্যা তাই কে ভাববে তা নিয়ে সংশয়।

এই অবসরে কারখানা চত্বরের ভুক্তভোগী মানুষজনদের ভূমিকা গেছে গৌণ হয়ে। জোয়ারে ভেসে গেছে ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনগুলিও। বুঝেই উঠতে পারেননি বিষয়টিতে তাদের ভূমিকাই মুখ্য। চোখ ফিরিয়ে বসে থেকেছেন। ফলে না বুঝেছেন বিষয়টি। না পেরেছেন গড়ে তুলতে কোন স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গী। এই সুযোগে পরিবেশ বিষয়ে মঞ্চ অধিকার করে বসেছেন যত অলস বৃত্তির লোকজন। সমস্যার কেন্দ্রবিন্দু থেকে বহুদূরে যাদের অবস্থান। যাদের কাছে ইস্যুটি নিছক মগজ চর্চার বিষয়। ফলে শত শত ওয়ার্কশপ-সেমিনারে ভুঁই-ফোঁড় লোকজন অজস্র ছেঁদো কথার ফোয়ারা ছোটাচ্ছেন। সমস্যা মোকাবেলায় যাঁদের কথা কিংবা কাজের কানাকড়ি দাম নেই। এ এক অদ্ভূত পরিস্থিতি! ভুক্তভোগী জন দর্শকের ভূমিকায়। সখের কারবারিরা ময়দানে গলা ফাটাচ্ছেন!

ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনগুলির অপ্রস্তুত অবস্থা নগ্ন হয়ে পড়ল সাম্প্রতিক কোর্ট অর্ডারের পরে। এতটাই অপ্রস্তুত তাঁরা যে এমন একটি সুযোগ হাতে পেয়েও নিজেদের কর্তব্য স্থির করে উঠতে পারেন নি। মামুলি দু-একটি প্রেস বিবৃতি ছাড়া। তাতেও পারেননি কোর্টের রায়কে স্বাগত জানাতে। অথচ দেশের সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের এই আদেশ তাঁদের পক্ষে একটি অনুকূল সামাজিক বাতাবরণ সৃষ্টি করেছিল। প্রস্তুত থাকলে এই সুযোগে যথেষ্ট চাপ সৃষ্টি করতে পারতেন পরিচালন কর্তৃপক্ষের ওপর। বাধ্য করতে পারতেন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে। কারণ তাঁদের যুক্তি হত—এই ব্যবস্থা নেওয়া না নেওয়ার ওপর নির্ভর করছে তাদের রুটি-রুজি। এই সুযোগ তো নিতে পারলেনই না। উপরন্তু রায়ের জের এখন তাঁদের ঘাড়েই এসে পড়ল। সংশ্লিষ্ট কারখানার লোকজন দিন গুণছেন কবে বন্ধ হবে কারখানা! কোর্টের মুখ চেয়ে বসে আছেন। কারখানা বন্ধ হলেও কোর্টের রায়ে যদি মামুলি ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থাটুকু হয়!

For Refracting, Reflecting And Composite Type of
TELESCOPES
write to
ROHINI ASTROPHYSICS
120, Sarat Chaterjee Road Barat Lake Town P. O. Calcutta-700 089

নীচের 30টা কারখানাকে 6 ফেব্রুয়ারী '95 সুপ্রীম কোর্ট আদেশ দিয়েছে এপ্রিল '95 এর মধ্যে জল ও বায়ু দূষণ নিরোধক যন্ত্র বসাবার এবং এ ব্যাপারে অন্যথা হলে কারখানা বন্ধ করে দেওয়া হবে বলা হয়েছে।

1. ইণ্ডিয়া গভর্নমেন্ট মিন্ট আলিপুর, কলকাতা-53
2. দ্য কেলভিন জুট কোং লিঃ তালপুকুর, 24 পরগণা (উঃ)
3. এন জে এম সি লিঃ (আলেকজান্দ্রা ইউনিট) জগদ্দল, 24 পরগণা (উঃ)
4. জেসপ কোং লিঃ 8 মঙ্গলপাণ্ডে রোড, কলকাতা-28
5. টেক্সম্যাকো লিঃ আগরপাড়া ওয়ার্কস, কলকাতা-56
6. টেক্সম্যাকো লিঃ বেলঘরিয়া ওয়ার্কস, কলকাতা-56
7. হিন্দ ওয়্যার ইণ্ডাস্ট্রীজ লিঃ একফোর্ড লিঃ সুখচর, 24 পরগণা (উঃ)
8. হিন্দুস্থান ওয়্যার লিঃ বি টি রোড, সুখচর, 24 পরগণা (উঃ)
9. জেসপ এ্যাণ্ড কোং দুর্গাপুর, বর্ধমান
10. এম এ এম সি লিঃ দুর্গাপুর 10, বর্ধমান
11. বার্ণ স্ট্যাণ্ডার্ড কোং লিঃ বার্ণপুর, বর্ধমান
12. এন জে এম সি লিঃ (ইউনিয়ন ইউনিট) 12, কনভেন্ট লেন, কলকাতা-15
13. অ্যাসোসিয়েটেড পেপার ইণ্ডাস্ট্রীজ 1, জয়কৃষ্ণ ঘোষাল রোড, কলকাতা-57
14. টিটাগড় জুট ফ্যাক্টরী টিটাগড়, 24 পরগণা (উঃ)
15. রামস্বরূপ ইণ্ডাস্ট্রীয়াল কর্পোঃ ডি ব্লক, কল্যাণী, নদীয়া
16. ব্ল্যাক ডায়মণ্ড বেভারেজেস লিঃ পি 41, তারাতলা রোড, কলকাতা-88
17. ইউনিভার্সাল পেপার মিল ঝাড়গ্রাম, মেদিনীপুর
18. ইণ্ডাস আইসক্রীম (রোলিক) মোলাপুর, হুগলী
19. জয়শ্রী টেক্সটাইলস রিষড়া, হুগলী
20. মেটাল অ্যাণ্ড ওর্‌স কোং পি 4 ট্রান্সপোর্ট ডিপো রোড, কলকাতা-88
21. অ্যাণ্ড্রু ইয়ুল এ্যাণ্ড কোং গয়েশপুর, কল্যাণী, নদীয়া
22. বিড়লা জুট অ্যাণ্ড ইণ্ডাস্ট্রীজ লিঃ বিড়লাপুর, 24 পরগণা (দঃ)
23. হিন্দুস্থান লিভার লিঃ ৬৩ গার্ডেন রীচ রোড, কলকাতা-24
24. রেকিট অ্যাণ্ড কোলম্যান (ইণ্ডিয়া) লিঃ আসানসোল, বর্ধমান
25. ইলেকট্রিক ল্যাম্প ম্যানুঃ তারাতলা রোড, কলকাতা-24
26. উমা আয়রন অ্যাণ্ড স্টীল খড়গপুর, মেদিনীপুর
27. জেনসন অ্যাণ্ড নিকলসন
28. অ্যালায়েড রেসিন অ্যাণ্ড কেমিক্যালস লিঃ রামপুর, বজবজ ট্রাঙ্ক রোড-2, 24 পরগণা (দঃ)
29. কোলম্যাক কেমিক্যালস লিঃ গয়েশপুর, কল্যাণী, নদীয়া
30. ব্রুক বণ্ড লিপটন ইণ্ডিয়া লিঃ আটপুর, শ্যামনগর, 24 পরগণা (উঃ)

সংযোজন

লেখাটি প্রেসে যাওয়ার পর সুপ্রীম কোর্টের কাছ থেকে আরো একটি নির্দেশ এসেছে। রাজ্যের পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ডকে বলা হয়েছে বিভিন্ন কারখানা চত্বরের দূষণের ফলে সেখানকার শ্রমিক কর্মচারীরা কি ধরনের রোগে আক্রান্ত হচ্ছেন সে বিষয়ে একটি রিপোর্ট তৈরী করতে। এ ব্যাপারে বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন এবং নাগরিক মঞ্চের সাথে যোগাযোগ করতে বলা হয়েছিল। এই নির্দেশ এমনি এমনি আসেনি। পেছনে একটি উদ্যোগ আছে। খুবই তাৎপর্যপূর্ণ সে ঘটনা। তিরিশটি কারখানা বন্ধ করে দেওয়ার নির্দেশ আসার পর অনেকেই খুব বিচলিত বোধ করছিলেন। তার মধ্যে আমাদের বন্ধু-সংগঠন নাগরিক মঞ্চও ছিল। তবে তাঁরা চুপ করে বসে থাকেননি। তাঁদের উদ্বেগের কথা সংশ্লিষ্ট বিচারপতির কাছে জানিয়েছেন। আমাদেরকেও উৎসাহিত করেছেন যেন আমরাও আমাদের প্রতিক্রিয়া বিচারপতিকে জানাই।

এর সাথে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ তাঁরা নিয়েছিলেন। সমস্ত ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনের কাছে আবেদন করেছিলেন যৌথভাবে কিছু উদ্যোগ নেওয়ার জন্য। ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে বুঝিয়েছিলেন পলিউশনসংক্রান্ত ব্যাপার হলেও এবিষয়ে তাঁদের দায়িত্ব আছে। ফল হয় এতে। ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনগুলি বিষয়টি নিয়ে একত্রে আলোচনায় বসতে রাজী হন। সম্ভবতঃ এই প্রথম এমন একটি বিষয়ে যৌথ আলোচনা। ঠিক হয় যে সবাই মিলে সুপ্রীম কোর্টের কাছে একটি আবেদন রাখবেন। কেবল সিটু বাদে। আলোচনায় যোগ দিয়েও শেষ পর্যন্ত তাঁরা পেছিয়ে যান। আর যাঁরা এতে সামিল হয়েছিলেন তার মধ্যে ছিলেন INTUC, AITUC, UTUC এবং নাগরিক মঞ্চ। সেই যৌথ আবেদনের ফল হল এই নির্দেশ। যদিও তাতে আরো অনেক বিষয়ের উল্লেখ ছিল। কিন্তু মাননীয় বিচারপতি শুধু এই বিষয়েই তাঁর প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন। □ **রবীন চক্রবর্তী**

একটি আবেদন

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী পত্রিকার 1994 সালের চারটি সংখ্যা একত্রে পাওয়া যাচ্ছে। মূল্য : 20 টাকা (ডাক খরচ সহ)। 1995-96 সালের জন্য গ্রাহক হোন।

গ্রাহক চাঁদা : ব্যক্তি—বার্ষিক 16 টাকা (ডাক যোগে 20 টাকা)

* বিশেষ ক্ষেত্রে 10 টাকা (ডাক যোগে 14 টাকা)

প্রতিষ্ঠান : বার্ষিক 50 টাকা (ডাক খরচ সহ)

বিজ্ঞানকর্মী সংস্থার বার্ষিক সদস্য চাঁদা : 25 টাকা (বিশেষ ক্ষেত্রে 15 টাকা)

* সদস্যরা গ্রাহক চাঁদা ছাড়াই পত্রিকা পাবেন।

'বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী'—এই নামে ব্যাংক-ড্রাফট বা মানি-অর্ডার করে টাকা পাঠাতে পারেন। কুপনের নীচে স্পষ্টভাবে নাম-ঠিকানা লিখবেন।

* পুরনো বি ও বি-র সংখ্যার জন্য যোগাযোগের ঠিকানায় লিখুন।

কলকাতার তপসিয়া অঞ্চল ও তার পরিবেশ

পূর্ব কলকাতার তপসিয়া অঞ্চলে এক-আধবার যিনি গেছেন তিনি জানেন কি ভয়ংকর পরিবেশে থাকেন সেখানকার মানুষজন। কোন রকম পরিকল্পনা ছাড়াই গড়ে উঠেছে বসতি। যেখানে নেই নাগরিক জীবনের মামুলি সুযোগ সুবিধেটুকু। তার ওপর গোটা এলাকা জুড়ে ছড়িয়ে আছে অজস্র ছোট ছোট শিল্প-কলকারখানা। অনুষঙ্গ হিসেবে আছে পুলিশ-মাস্তান-ধর্ম-রাজনীতির জটিল আবর্ত।

সম্প্রতি সেখানকার একজন নাগরিক 'বিওবি'র দপ্তরে একখানা চিঠি পাঠিয়েছেন স্থানীয় একটি কারখানার দূষণজনিত সমস্যার কথা জানিয়ে। আমাদের মনে হয়েছে ওনার এই চিঠির মধ্য দিয়ে শুধুমাত্র একটি দূষণের চিত্রই প্রকাশ পায়নি—বেরিয়ে এসেছে গোটা এলাকার সামাজিক চিত্রটি। এতে আছে লাগাতার লড়াই চালিয়ে যাওয়ার কথা। যথেষ্ট দুঃসাহসের কাজ এটা। তপসিয়ার অধিবাসী মাত্রেই তা জানেন। নাও জানতে পারেন অন্য এলাকার মানুষজন। আমরা বিষয়টির গুরুত্ব অনুভব করে চিঠিপত্রের কলমে না ছেপে সাধারণ প্রতিবেদন হিসেবেই ছাপলাম। চিঠিতে যেমনভাবে লিখেছেন সেভাবেই। পত্র-লেখকের নাম মাজহার উল হোসেন।

সঃ মঃ

তপসিয়া ও পরিবেশ দূষণ অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে অপরাধ-প্রবণতা। সম্ভবতঃ কলকাতার মধ্যে একমাত্র তপসিয়াতেই সব থেকে বেশী বে-আইনী ঘর-বাড়ী তৈরী হয়েছে রাজনৈতিক নেতা—প্রোমোটার—পুর-কর্মী—পুলিশের যোগসাজশে।

এখানে পরিবেশ দূষণের জন্য মূলতঃ দায়ী হাওয়াই চপ্পল কারখানার মালিক, কলকাতা পুরসভা, পঃ বঃ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ এবং সর্বোপরি রাজ্য সরকার। এখানকার অসংখ্য বে-আইনী—আইনী কারখানা মালিকদের একজনও এখানে থাকেন না।

এই রকম একটা কারখানা হ'ল—হিন্দুস্তান রবার ইণ্ডাস্ট্রীজ, 31/Q রাইচরণ ঘোষ লেন, কলকাতা-700039 (ওয়ার্ড নং-66)। এই কারখানার বিরুদ্ধে মূল অভিযোগ হোল—বিষাক্ত গ্যাস ও ধুলোজনিত বায়ুদূষণ এবং শব্দ দূষণ। চিমনী দিয়ে কালো ধোঁয়া উদ্গীরণের ফলে চারপাশের ঘরের আসবাবপত্র থেকে শুরু করে পানীয় জল পর্যন্ত দূষিত হয়ে পড়েছে। বইপত্রের উপর জমা ধুলোবালি পরীক্ষা করলেই বোঝা যাবে এখানে বায়ুদূষণের পরিমাণ কতটা মারাত্মক।

প্রত্যেকটা চপ্পল কারখানাকেই ব্যবহার করতে হয়—একাধিক রাসায়নিক যৌগ। ফল এই যে প্রায় সর্বক্ষণই গ্যাসীয় দূষণ ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে বাতাসে। আর সেই দূষিত গ্যাস আমাদের নিশ্বাসের সঙ্গে গ্রহণ করতে হচ্ছে।

এইসব কারখানা চব্বিশ ঘণ্টাই চলে। ফলতঃ তার চারপাশের বাড়ী-ঘর ও লোকজনের উপর তার প্রতিক্রিয়া সাংঘাতিক। শব্দ দূষণের নানাবিধ কুফলে বধিরতা, রক্তচাপ, হজমের গোলমাল, নিদ্রাহীনতা, খিট-খিটে মেজাজ—এ সবের অনায়াস শিকার এই সব মানুষেরা।

আমার বাড়ীর পাশেই যে কারখানাটি আমাদের জীবন দুর্বিষহ করে তুলেছে তার নাম আগেই জানিয়েছি। সেই হিন্দুস্তান রবার

ইণ্ডাষ্ট্রীজের মালিকের নাকি সুনাম আছে 'জনহিতকর' কাজের। তবে, যতক্ষণ না সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধছে। ততক্ষণ 'জনহিতকর' কাজ করা সম্ভব হয় না ওনার পক্ষে। আর অন্যদিকে দেখা যাচ্ছে তার প্রতিবেশীকে বিদ্যুৎ না দেওয়ার জন্য কনজিউমার কোর্টের আদেশ জাল করতেও দ্বিধাগ্রস্ত নন তিনি। আবার সেই প্রতিবেশী বাংলাভাষী হওয়ার ফলে, ডিসেম্বর '92-র দাঙ্গায় তার বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হলো যথেচ্ছ বিস্ফোরক মসলা—ত্রাস ও ভীতি সঞ্চারের জন্য।

1990 সালে প্রথম দেখা গেল কারখানা চালানোর সময়সীমা বেড়ে গেছে। প্রথমে ছিল রাত দশটা, পরে রাত বারোটা এবং এক সপ্তাহ পরেই সারা রাত।

সেই 1990 সালেই প্রথম কারখানাটির বিরুদ্ধে লিখিতভাবে আপত্তি জানানো হলো মাননীয় মেয়র ও দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদে। কিন্তু কোনো ব্যবস্থাই নিলেন না কর্তৃপক্ষ। এবং এই সময়েই ঐ কারখানায় আমদানী করা হ'লো নতুন নতুন আরো মেশিন। যেমন, কাটিং পাঞ্চিং ও ড্রিলিং মেশিন।

যথারীতি এই সবের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানানো হ'লো সকলের কাছেই। কাজ কিছুই হ'লো না। স্বাস্থ্য সচিবের আদেশানুসারে হাওড়ার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক 31/3/92 তারিখে সরেজমিন তদন্ত করলেন এবং রিপোর্ট দিলেন যে ঐ কারখানা জনস্বাস্থ্য হানিকর ('hazardous to health')। কলকাতা পুরসভার বরো-ডাক্তার এলেন, তদন্ত করলেন, চলে গেলেন। বার বার লিখিত প্রার্থনা করেও কোনো কিছুই জানতে পারলাম না। মাননীয় নগরোন্নয়ন মন্ত্রী শ্রীঅসীম দাশগুপ্ত মহাশয়কে জানানো সত্ত্বেও তিনি নিশ্চুপ, নিরুত্তর—আর সব মন্ত্রীর মতই। স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসুকে আজ পর্যন্ত 16 বার স্মরণ করিয়ে দিয়েছি লিখিতভাবে। প্রাপ্তি স্বীকার পর্যন্তও করা হয় নি।

একমাত্র বরো ডাক্তার একটি চিঠি দিয়ে জানিয়েছেন যে ঐ কারখানার কোনো রকম লাইসেন্স বা বৈধ অনুমোদন, এমনকি অনুমতিপত্রও নেই। তাই সি এম সি অ্যাক্টের 419 এবং 435 ধারা অনুযায়ী ঐ কারখানার বিরুদ্ধে পুরআদালতে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। 22 আগস্ট 1992 সালে সুপ্রীম কোর্ট বিভাগীয় মন্ত্রীকে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে নির্দেশ দেন। 5 জানুয়ারী '93 এবং 15 এপ্রিল '93 তারিখে পুনরায় নির্দেশ জারী হয় বিভাগীয় মন্ত্রী ও দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের চেয়ারম্যানের উদ্দেশ্যে।

ইতিমধ্যে দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের মুখ্য পরিদর্শক তদন্তে এলেন 10.5.93 তারিখে। চলেও গেলেন। তদন্তের ফলাফল জানবার জন্য চেষ্টা করতে করতে 21.2.94 তারিখে একপ্রস্থ রিপোর্ট দেওয়া হোল। কারখানাটিকে সমস্ত রকম অভিযোগ থেকে বেকসুর খালাস করে দেওয়া হলো। আর তারপরই শুরু হলো দ্বিগুণ মাত্রায় অত্যাচার।

কলকাতার বিশিষ্ট দৈনিক অনুসন্ধান করে জানতে পারলো যে উপযুক্ত অর্থের বিনিময়ে পর্ষদ থেকে এরকম 'সার্টিফিকেট' পাওয়া আদৌ কোন কষ্টকর ব্যাপার নয়।

7.4.94 তারিখে ভারত সরকারের পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় দক্ষিণ 24 পরগণার জেলা শাসককে ঐ কারখানার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে এবং 30 দিনের মধ্যে বায়ু দূষণ নিরোধক যন্ত্র বসানোর ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে বলেন। অভিযোগকারীকে অনুরোধ করা হয় মন্ত্রণালয়কে জেলাশাসকের নাম ও টেলিফোন নম্বর জানাতে। তাও জানানো হয়েছে।

কিন্তু বাস্তব অবস্থা যে তিমিরে সেই তিমিরেই। সে কি এই কারণে যে ঐ কারখানার এক এজেন্টকে দেখা গেছে এই অঞ্চলের সমস্ত কারখানা মালিকের কাছ থেকে মোটা অঙ্কের অর্থ চাঁদা স্বরূপ আদায় করতে। ঐ টাকা নাকি বিভিন্ন দপ্তর ও রাজনৈতিক দলের তহবিলে যাবে।

বোধহয় এইসব কারণেই আমরা যারা অভিযোগকারী, কোনো ফল ব্যতিরেকেই একইভাবে নির্যাতিত হয়ে আসছি। প্রশাসনের কোনো স্তরেই কোনো রকম সদিচ্ছা লক্ষ্য করা যাচ্ছে না।

ফলতঃ উৎসাহিত বোধ করছে কারখানা মালিক আর সেই উৎসাহে সমাজবিরোধী তথা দাগী অপরাধীদের নিয়োগ করছে আমাদের বিরুদ্ধে।

গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি সাহায্যের হাত না বাড়িয়ে দিলে এতদিনে হয়ত ইহলোকের মায়া ত্যাগ করতে হত।

আজ পর্যন্ত একই ব্যাপারে ঐ কারখানার বিরুদ্ধে 21 বার এফ. আই. আর. দায়ের করা হয়েছে। এমন কি এফ. আই. আরের কপি জেলাশাসক, পুলিশ সুপার, স্বরাষ্ট্র সচিব, ডি. জি., মহকুমা শাসক—সবাইকে দেওয়াও হয়েছে।

গত 8.10.94 তারিখে সুপ্রীম কোর্ট পুনরায় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদকে ব্যবস্থা নিতে নির্দেশ দিয়েছেন। সেই নির্দেশ কার্যকরী করতে এ. পি. ডি. আর. সবাইকে অনুরোধ জানানো সত্ত্বেও আজো দূষণ 1990 সালের মতই অব্যহত। জানি না, কবে প্রশাসনের সদিচ্ছা জাগবে।

সংখ্যালঘু অধ্যুষিত অঞ্চলের বাসিন্দা হিসাবে অর্জিত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে কটা কথা বলতে পারি যে স্থানীয় রাজনীতি-প্রশাসন-অপরাধ-প্রবণতার অশুভ আঁতাতের কারণ এই যে এদের কাছ থেকে যেমন অনায়াসে খুব বেশী আদায় করা যায় ঠিক তেমনি অনায়াসেই এদেরকে 'টাডা'য় আটকানো যায়। রশিদের ইতিহাস চোখে আঙ্গুল দিয়ে এটা দেখিয়ে দিয়েছে সবাইকে। আর আমাদের দেখাচ্ছে হিন্দুস্তান রবার ইণ্ডাস্ট্রীজের 'দাগী অপরাধী' মালিক কিভাবে আর্থিক কৌলিন্যের জোরে প্রশাসনকে তার গাড়ীর স্টিয়ারিংয়ের মতই ডাইনে বাঁয়ে ঘোরানো যায়।

এই প্রতিবেদন শেষ করছি এই তথ্য দিয়ে যে মাননীয় মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক (হাওড়া), তাঁর প্রতিবেদনে এই কারখানাকে 'জনস্বাস্থ্য হানিকর' বলে চিহ্নিত করেছেন। আর সেটা কতটা নির্মম সত্য টের পাচ্ছি স্ত্রী-পুত্রের X-ray report থেকে।

☐ মাজহার উল হোসেন

ঝরিয়ার গজলিটাঁড় কয়লাখনিতে সম্প্রতি ঘটে যাওয়া দুর্ঘটনা মনে পড়িয়ে দিলো পুরোনো দিনের কথা—চাসনালা খনির কথা। শুধু প্রাকৃতিক দুর্যোগ নয়, এটা প্রমাণিত অন্য অবহেলা রয়ে গেছে এই দুর্ঘটনার পিছনে। বন্যায় ফুলে ফেঁপে ওঠা কোতরি নালার জল বিপদ-সীমা ছাড়াচ্ছে কিনা লক্ষ্য করার জন্য নজরদারির ব্যবস্থা ছিল আগে। বর্তমান ঠিকাদার বি. কুমার এ বাবদে খরচ করা বাহুল্য মনে করে লোক সরিয়ে নেয়। ফলতঃ কোনরকম সতর্কবার্তা পাওয়া যায় নি যাতে কর্মরত শ্রমিকদের খনি থেকে সরিয়ে আনা যায়। 68টি মৃত্যুর জন্য দায়ী এই ঠিকাদারের লোভ। এর পরেও কি এরা কোনরকম শাস্তি ছাড়াই নিষ্কৃতি পেয়ে যাবে—আরও অনেক চাসনালা ঘটানোর জন্য!

☐ ☐ ☐ ☐

বি ও বি-র পুরোন সংখ্যা নিয়ে বাঁধান একটি ভল্যুম পাওয়া যাচ্ছে না। কেউ খোঁজ পেলে সাক্ষরকারীর সাথে যোগাযোগ করুন।

রবীন চক্রবর্তী

রামকৃষ্ণ মিশনের দাবী নাকচ করল সুপ্রীম কোর্ট

রামকৃষ্ণ মিশনের দাবী ছিল তাঁরা হিন্দুধর্মের অন্তর্গত নন। তাঁরা হিন্দু ধর্মের বাইরে ভিন্ন এক ধর্ম-সম্প্রদায়। —রামকৃষ্ণবাদী। রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সদস্যরা হিন্দু নন। অতএব আর পাঁচটা সংখ্যালঘু ধর্ম-সম্প্রদায়ের মত তাঁরাও 'সংখ্যালঘু' হিসেবে সংবিধানপ্রদত্ত বিশেষ সুবিধের অধিকারী। এই দাবীতে তাঁরা আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। কিন্তু ভারতের সর্বোচ্চ আদালত সুপ্রীম কোর্ট তাঁদের এই দাবী নাকচ করে দিয়েছেন।

প্রশ্ন জাগতে পারে রামকৃষ্ণ মিশন হঠাৎ এমন একটি দাবী তুলতে গেলেন কেন। এজন্য একটু আগের ইতিহাস বলতে হয়। সংক্ষেপে বলতে গেলে তাঁদের ঐ দাবী ওঠে খড়দহের বিবেকানন্দ সেণ্টিনারী কলেজের পরিচালন সংক্রান্ত বিবাদের সূত্রে। তাঁরা চাইছিলেন কলেজ পরিচালনার ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রণীত 'পশ্চিমবঙ্গ কলেজ টিচার্স (সিকিউরিটি অব সার্ভিস) এ্যাক্ট, 1975' এবং 'কলেজ সার্ভিস কমিশন এ্যাক্ট, 1979" এই আইনদুটোর আওতার বাইরে থাকতে। চাইছিলেন নিজেদের নিয়মে কলেজ চালাতে। সংখ্যালঘু ধর্মসম্প্রদায় পরিচালিত সংস্থা হলে সংবিধানের বিশেষ আইনবলে সেটা সম্ভব। তাই এই উদ্যোগ নিয়েছিলেন তাঁরা।

তাঁদের উদ্যোগ প্রায় সফল হয়ে এসেছিল। প্রথমে তাঁরা এই আর্জি পেশ করেন কলকাতা হাইকোর্টে। 1981 সালে। বিচারপতি শ্রী বি. সি. ব্যানার্জী শুনানী ছাড়া তাঁদের লিখিত আবেদনের ভিত্তিতেই রামকৃষ্ণ মিশনের সপক্ষে রায় দেন।

এই রায়ের বিরুদ্ধে আপীল হয় ডিভিশন বেঞ্চে। এবারেও তাঁদের পক্ষে রায় হয়। বিচারপতি ছিলেন শ্রী চিত্ততোষ মুখার্জী এবং শ্রী ভগবতী প্রসাদ ব্যানার্জী। এঁরা মিশনকে সংবিধানের 26 এবং 30 এই দুটি ধারার সুবিধেই দেন। অর্থাৎ মিশন সংখ্যালঘু ধর্মীয় সম্প্রদায় এবং তাঁদের পরিচালিত সংস্থাটি সংখ্যালঘুদের প্রতিষ্ঠানের বিশেষ সুবিধের অধিকারী।

এই রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রীমকোর্টে আপীল করেন কলেজের অধ্যাপকগণ। পশ্চিমবঙ্গ সরকার এর পার্টি হন। সেটা 1985 সাল। সেই থেকে দীর্ঘ দশ বছর যাবৎ ঝুলে ছিল মামলাটি। উঠবে উঠবে করেও কোন অজ্ঞাত কারণে আর উঠছিল না। তবে এই ফাঁকে বেশ কয়েকশ রামকৃষ্ণ মিশনের সদস্যও এই মামলার পার্টি হয়ে যান। তাঁদের আর্জি মিশনের বিরুদ্ধে। কারণ মিশনের সদস্য হিসেবে তাঁরা অহিন্দু' হিসেবে চিহ্নিত হতে রাজী নন।

ইতিমধ্যে বেশ কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি মামলাটির দ্রুত নিষ্পত্তির অনুরোধ জানিয়ে আবেদন করেন। এবং অবশেষে গত মার্চ মাসের নয় এবং দশ তারিখে মামলাটির শুনানী হয়। শুনানী চলে তিনজন বিচারপতির ফুল-বেঞ্চে। বিচারপতিরা হলেন মিঃ কুলদীপ সিং, মিঃ ভেঙ্কটচালিয়া এবং মিঃ সাগির আহ্‌মেদ।

গত দোসরা জুলাই রায় বেরোয়। তাঁরা কলকাতা হাইকোর্টের প্রদত্ত রায় খারিজ করে দিয়েছেন। এবং বিস্ময় প্রকাশ করেছেন—কিভাবে এমন রায় দেওয়া হয়েছিল। অর্থাৎ রামকৃষ্ণ মিশন আর সংখ্যালঘু ধর্মসম্প্রদায় হিসেবে বিবেচিত হবে না এবং তাঁদের পরিচালিত সংস্থা সংখ্যালঘু সংস্থার বিশেষ সুবিধেও পাবে না।

| র. চ.

"বিবেকানন্দ সেন্টিনারী কলেজ"—প্রসঙ্গটি প্রকাশিত হয়েছিল 'বি ও বি'র জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী 1981 সংখ্যায়। হুবহু লেখাটি পুনর্মুদ্রণ করা হল। সেদিনের পরিস্থিতি মনে করিয়ে দেওয়ার জন্য। মাঝে গড়িয়ে গেছে এতগুলি বছর। আইনী লড়াই অবশেষে সুপ্রীম কোর্টে গিয়ে পৌঁছেছিল। অসীম ধৈর্য সহকারে এই অসম লড়াই চালিয়ে গেছেন কিছু শিক্ষক। অবশেষে সর্বোচ্চ আদালতের রায় তাদের পক্ষেই গেছে। তবে এজন্য অনেক মূল্য দিতে হয়েছে তাঁদের। অভিনন্দন জানাই তাঁদের।

সঃ মঃ

প্রসঙ্গঃ বিবেকানন্দ সেন্টিনারী কলেজ

একদিকে যখন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সম্মেলনে মানুষের অসীম সম্ভাবনার দ্বার খুলে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি শোনা যাচ্ছে তখনই আমরা দেখতে পাচ্ছি রহড়ায় অবস্থিত বিবেকানন্দ সেন্টিনারী কলেজ নামক বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানটিতে ধর্মীয় বর্মের আড়ালে রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃপক্ষ এক অচলাবস্থার সৃষ্টি করেছে। সমস্ত সরকারী আইনকানুনকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে, বাজারী সংবাদপত্রের মাধ্যমে জনমানসে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে কায়েমী স্বার্থ বজায় রাখার অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

1963 সালে সম্পূর্ণ সরকারী অর্থে বিবেকানন্দ সেন্টিনারী কলেজ একটি গভর্নমেণ্ট স্পন্‌সর্ড কলেজরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। একটি এড হক কমিটি দ্বারা এই কলেজটি পরিচালিত হতে থাকে। 1969 সালে রাষ্ট্রপতি শাসন চালু থাকা কালে এই কলেজের একটি বিশেষ গঠনতন্ত্র কায়েম করা হয়। গঠনতন্ত্র অনুযায়ী পরিচালন সমিতিতে রামকৃষ্ণ মিশনের ৩ জন প্রতিনিধি থাকলেও এই সংবিধান পরিচালন সমিতিকে যে বিশেষ কোন অধিকার দেয় নি তা স্পষ্ট হয় ডি. পি. আই.-এর লেখা একটি চিঠি থেকেঃ 'এই কলেজটির পরিচালনা সম্পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রিত হবে গভর্ণমেণ্ট স্পন্‌সর্ড কলেজের নিয়মানুযায়ী।' 1975 সালে রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃপক্ষ কতকগুলি অসম্মানজনক হীন শর্ত শিক্ষকদের উপর চাপিয়ে দেয়। শিক্ষকদের 'মিশনের কর্মচারী' হিসেবে নিয়োগ করা হয়। কোন প্রকার পূর্ব বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই শিক্ষকদের বয়েজ হোমের যে কোন প্রতিষ্ঠানে বদলি করা যাবে, তিন মাসের বিজ্ঞপ্তি সাপেক্ষে যে কাউকে চাকরী থেকে বরখাস্ত করা যাবে, কোন সংগঠন বা সমিতির সভ্য হতে হলে কর্তৃপক্ষের অনুমোদন প্রয়োজন হবে এবং কলেজ পরিচালন সমিতি রামকৃষ্ণ মিশন বয়েজ হোমের অধীনে একটি উপসমিতি হিসেবে কাজ করবে। আশ্চর্যের কথা হল পরিচালন সমিতি নয়, মিশন বয়েজ হোম কর্তৃপক্ষ এই কলেজের বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে। দীর্ঘ 3 বছরের সংগ্রামের মধ্য দিয়ে শিক্ষকরা 1978 সালের 20শে মে এই অসম্মানজনক শর্তাবলী প্রত্যাহার করাতে সক্ষম হন।

কিন্তু এতেও মিশন কর্তৃপক্ষ ক্ষান্ত হননি, কলেজ টীচার্স সারভিস সিকিউরিটি এ্যাক্ট 1975-এর আওতার বাইরে থাকার জন্য স্বামী শিবময়ানন্দকে বেলুড় বিদ্যামন্দির থেকে বিবেকানন্দ সেন্টিনারী কলেজে বদলী করা হ'ল, তার

মনোনয়ন করল রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃপক্ষ। অথচ বর্তমান আইন অনুযায়ী বেসরকারী কলেজে এবং গভর্নমেণ্ট স্পন্সর্ড কলেজে মনোনয়ন করার অধিকার একমাত্র সারভিস কমিশনেরই আছে। বর্তমানে মিশন কর্তৃপক্ষ এই সমস্ত বেআইনী কার্যকলাপকে আইনী করে তোলার জন্য ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বিশেষ সুবিধাভোগেরও আশা পোষণ করে। শিক্ষকেরা দীর্ঘদিন ধরে এর বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছেন, 25শে আগষ্ট, 1980 এর পর থেকে অবস্থান ও কর্মবিরতি করছেন। 11ই সেপ্টেম্বরের পর থেকে মিশন কর্তৃপক্ষের সমস্ত বিরোধিতা সত্ত্বেও শিক্ষকেরা ক্লাস নিচ্ছেন। যথাযথভাবে শিক্ষকদের দাবী হল ঃ বেআইনীভাবে নিযুক্ত অধ্যক্ষের অপসারণ, পরিচালন সমিতির (21-10-78এ যার আয়ুষ্কাল শেষ হয়েছে) পুনর্গঠন, সারভিস সিকিউরিটি এ্যাক্ট অনুযায়ী শিক্ষকদের নিয়োগ প্রথা ও চাকরীর নিরাপত্তা প্রণয়ন করা, সরকারী টাকায় তৈরী হোস্টেলটি অবিলম্বে ছাত্রদের স্বার্থে পুনরুদ্ধার করা, এবং কলেজ কর্তৃপক্ষ যে সমস্ত আর্থিক ও প্রশাসনিক বেআইনী কাজকর্ম করেছে সেগুলির পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করা।

রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃপক্ষ এই সম্ভাবনাময় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটিকে এক অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ এর দিকে ঠেলে দিয়েছে, মিশন মার্কা গণতন্ত্রের বলি হয়েছেন বিবেকানন্দ সেণ্টিনারী কলেজের শিক্ষকবৃন্দ। এই বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানটিকে বাঁচাতে হলে অবিলম্বে সরকারী হস্তক্ষেপ প্রয়োজন।

পার্থ সেন নরসিংহ দত্ত কলেজ

* 'বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী'কে ঠিক সময়ে উপযুক্ত বিষয়বস্তু সহ প্রকাশিত হতে সাহায্য করুন।

* লেখা পাঠান—উন্নয়ন'কে ঘিরে বিতর্ক বা পরিবেশ দূষণ সংক্রান্ত রচনা—গণস্বাস্থ্য বা নিউক্লিয়ার শক্তি সব কিছুই বি ও বি সাদরে গ্রহণ করবে। বিশেষ অনুরোধ—স্থানীয় সমস্যাভিত্তিক রিপোর্ট, অনুসন্ধান বা সমীক্ষার জন্য বি ও বিতে নিয়মিত বিভাগ রাখা হচ্ছে। এই বিভাগে লেখা পাঠান।

* গ্রাহক হোন, কাছের মানুষদের গ্রাহক হতে সাহায্য করুন। একটি ছোট্ট উদ্যোগকে বাঁচিয়ে রাখতে আপনার সহযোগিতা খুবই জরুরী।

* বি ও বি পাওয়া যাচ্ছে—বি বা দি বাগ—টেলিফোন ভবনের উল্টোদিকের কয়েকটি স্টল। উৎস মানুষ, বুক মার্ক ও রাসবিহারী—আশুতোষ মুখার্জী রোড জংশন, ডেকার্স লেন (দিলীপ মজুমদারের স্টল)।

ফ্রান্স ফের শুরু করল

নিউক্লিয়ার বোমার পরীক্ষা

ফের ফরাসী বোমা

ফরাসী সরকার তাদের জেদ বজায় রাখলেন। ফের শুরু করলেন পারমানবিক বোমার পরীক্ষা। দুনিয়া জোড়া বিক্ষোভ প্রতিবাদ আবেদন-নিবেদন তাঁদের টলাতে পারল না। গত 5ই সেপ্টেম্বর প্রথম বিস্ফোরণটি ঘটালেন। এমন আটটি বোমার পরীক্ষা চালাবেন এই পর্বে। আপাততঃ এই পরিকল্পনা।

পারমাণবিক কেন্দ্রের দৌড় খানিকটা থিতিয়ে এসেছিল। আবার তাতিয়ে দিলেন তাঁরা। মাঝে স্থগিত রেখেছিলেন পরীক্ষা। গত বিরানব্বই সাল থেকে। সম্প্রতি সেখানে সরকার বদল হয়েছে। সোসালিস্ট দলের জায়গায় রক্ষণশীল দল ক্ষমতায় এসেছে। নতুন প্রেসিডেণ্ট জ্যাক চিরাক। গদিতে বসে তাঁর প্রথম গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত হল ফ্রান্স ফের পারমাণবিক বোমার পরীক্ষা শুরু করবে। দেশের নিরাপত্তার জন্য জরুরী এটা। জানিয়েছেন প্রেসিডেণ্ট। বলেছিলেন এই সেপ্টেম্বরে শুরু করবেন।— শুরু করেছেন।

পরীক্ষা নিজের দেশে নয়

দেশের নিরাপত্তার জন্য এই পরীক্ষা। তা বলে দেশের মাটিতে নয়। বিকিরণ জনিত কারণে যদি দেশের মানুষের ক্ষতি হয়? তাই দেশ থেকে আঠেরো হাজার কিলোমিটার দূরে অন্য দেশে গড়ে তুলেছেন পরীক্ষা কেন্দ্র। দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে। বেছে নিয়েছেন তাঁদের অধীন পলিনেশীয় দ্বীপপুঞ্জের দুটি দ্বীপ। মোরুরোয়া আটোল এবং ফাঙ্গাতৌফা আটোল। শত শত বোমার বিস্ফোরণে দ্বীপ দুটি এখন তেজস্ক্রিয় আবর্জনার স্তূপ মাত্র। অচিরেই পরিত্যক্ত হবে দ্বীপ দুটি। তারপর হাজার হাজার বছর ধরে বিকিরণ ছড়ানোর আতঙ্ক নিয়ে অপেক্ষা করতে হবে পৃথিবীকে। বিশেষ করে আশপাশের হাজার খানেক কিলোমিটারের মধ্যে যেসব দেশ তাদের মানুষদের।

প্রতিবাদে মুখর কতিপয় রাষ্ট্রপ্রধান

এবারের বিশেষ লক্ষণ যে কিছু কিছু দেশের রাষ্ট্রপ্রধানেরাও এবার সোচ্চার প্রতিবাদ জানিয়েছেন। ফের পরীক্ষা শুরু করবে ফরাসী সরকারের এই ঘোষণার সাথে সাথে দুনিয়া জুড়ে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে! কাজ হল না তাতে। প্রথম বোমার পরীক্ষা হয়ে গেল।

প্রতিবাদে চিলি এবং নিউজিল্যাণ্ড, ফ্রান্স থেকে তাদের রাষ্ট্রদূতদের ফিরিয়ে এনেছেন। নিউজিল্যাণ্ড তো ফ্রান্সের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক আদালতে মামলা করেছেন। এবং সত্বর শুনানী শুরু করার জন্য তদ্বির চালিয়ে যাচ্ছেন। দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরে অবস্থিত ছোট্ট দ্বীপ নউরু ফ্রান্সের সাথে সমস্ত সম্পর্ক আপাততঃ ছিন্ন করে দিয়েছেন। অস্ট্রেলিয়া আগেই ঘোষণা করেছিল ফ্রান্স যতদিন এই পরীক্ষা চালিয়ে যাবে ততদিন তাদের সাথে সামরিক বিষয়ক বাণিজ্যিক লেনদেন বন্ধ রাখবে। কানাডা ও জাপানের সরকারও ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূতদের ডেকে তাঁদের অসন্তোষের কথা জানিয়ে দিয়েছেন। পনেরটি দেশের ইউরোপীয়ান ইউনিয়নের বেশীর ভাগ দেশ ফ্রান্সের নিন্দা করেছেন। বিশেষ করে কারণ কিছুদিন আগেই বৈঠক করেছেন নিউক্লিয়ার নন-প্রলিফারেশনের চুক্তির সপক্ষে। যাতে ফ্রান্সও ছিল। আর ঠিক তার পরেই ফ্রান্সের এ আচরণ!

সুইডেনের সাথে ফ্রান্সের সম্পর্ক খুব খারাপ হয়ে উঠেছে। সুইডেনের প্রধানমন্ত্রীর প্যারিস সফর বাতিল করে দিয়েছেন ফরাসী সরকার। কারণ সুইডেনের সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রী তাহিতিতে আন্দোলনকারীদের প্রকাশ্যে মদত দিয়েছেন। স্বাধীনতাকামী গোষ্ঠীর সাথে হাত মিলিয়ে মিছিল করেছেন!

বিক্ষোভ প্রতিবাদ দেশে দেশে

বিস্ফোরণের আগে থেকে দক্ষিণ প্রশান্তসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত তাহিতিতে প্রবল বিক্ষোভ আন্দোলন চলছিল। বিশেষ করে এই আন্দোলনের পুরোভাগে ছিল স্বাধীনতা যুদ্ধের ফ্রন্ট। বিস্ফোরণ ঘটানো হলে তাঁদের আন্দোলন তীব্র হবে জানিয়েছিলেন তাঁরা। তার প্রমান আমরা জেনেছি সংবাদ পত্রের মাধ্যমে। তাহিতির রাজধানী এবং বিমানবন্দর দুদিনের জন্য বন্ধ করে দিয়েছিলেন তাঁরা।

খোদ ফ্রান্সেই এর বিরুদ্ধে তীব্র বিক্ষোভ আন্দোলন হয়েছে। আন্দোলনে সামিল হয়েছিলেন বিভিন্ন পরিবেশ এবং যুদ্ধ-বিরোধী সংগঠন। ফ্রান্সের সোসালিস্ট দলও এই আন্দোলনে সামিল হয়েছে। অস্ট্রেলিয়ায় আন্দোলনকারীরা ফরাসী দ্রব্য বর্জনের আহ্বান জানিয়েছিলেন। কাজ হয়েছে তাতে। কিছু কিছু ফরাসী সামগ্রীর বাজার পড়ে গেছে।—বিশেষ করে ফরাসী পানীয়ের।

গত মাসখানেক যাবৎ পরিবেশ সংগঠন 'গ্রীনপীস' নানান ভাবে বিক্ষোভ প্রতিবাদ জানিয়ে আসছেন বিশ্বের বিভিন্ন দেশে। বিশেষ করে উল্লেখযোগ্য তাঁদের 'রেইনবো ওয়ারিয়ার দুই' এবং 'ভেগা' এই দুটি জাহাজের তাহিতি অভিযান। এটা গ্রীনপীসের প্রতিবাদ জানানোর একটা পদ্ধতি। তাঁরা সমুদ্রপথে পৌঁছে যান জায়গায় জায়গায়। বিক্ষোভ দেখাতে হবে যেখানে। সরাসরি মুখোমুখি হন দুষ্কৃতকারীদের। এজন্য তাঁদের খেসারত দিতে হয় কম না।

ঠিক দশ বছর আগে এই মোরুরোয়া আটোলেই এক বিস্ফোরণের বিরুদ্ধে। প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে হারাতে হয়েছিল তাঁদের একটি জাহাজ। তারও নাম ছিল রেইনবো ওয়ারিয়ার। 1985 সালের জুলাই মাসে ফ্রান্স এইরকম একটি বোমার পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল। গ্রীনপীস তাদের জাহাজ 'রেইনবো ওয়ারিয়ার' নিয়ে রওনা হয়েছিলেন মোরুরোয়ার উদ্দেশ্যে—বিক্ষোভ জানানোর জন্য। পথে নিউজিল্যান্ডের অকল্যান্ড বন্দরে থেমেছিলেন কিছু সময়ের জন্য। এই সময় একদিন রাত্রে এক গুপ্তবাহিনী বোমার আঘাতে ডুবিয়ে দেয় 'রেইনবো ওয়ারিয়ার'। জাহাজের সাথে ডুবে মারা যান গ্রীনপীসের কর্মী ফার্নান্ডো পেরেয়িরা।

অকল্যান্ড পুলিশ প্রচন্ড তৎপরতায় মাত্র আটচল্লিশ ঘন্টার মধ্যে গ্রেপ্তার করেন দুই দুষ্কৃতকারীকে। এবং তাদের ফ্রান্সের নিয়োজিত এজেন্ট হিসেবে সনাক্ত করে পুলিশ। অভিযোগ অস্বীকার করেন ফ্রান্স সরকার। কিন্তু অচিরেই প্রমাণিত হয় যে ফরাসী গুপ্তবাহিনীই তাদের নিযুক্ত করেছিল। আন্তর্জাতিক আদালতে তা প্রমাণিত হয়। ফরাসী প্রধানমন্ত্রীকে এজন্য মার্জনা চাইতে হয়েছিল। আর ক্ষতি পূরণ হিসেবে নিউজিল্যান্ড সরকারকে দিতে হয়েছিল সত্তর লক্ষ ডলার। এবং গ্রীনপীস সংস্থাকে একাশি লক্ষ। এই অর্থে 'গ্রীণিপীস' সংগ্রহ করেছে আরেকটি জাহাজ এবং আগের জাহাজের স্মৃতিতে এটির নাম রেখেছেন 'রেইনবো ওয়ারিয়ার দুই'! এই জাহাজই এবার গ্রীনপীস কর্মীরা মোরুরোয়া আটোল দরিয়ায় পাড়ি দিয়েছিলেন বিক্ষোভ জানাতে। তবে তারা ফরাসী নৌবাহিনীর জাহাজ এবং হেলিকপ্টারের আক্রবণের মুখে পড়েন এবং আটক হয় তাদের জাহাজগুলি। গ্রীনপীস ছাড়াএ আরও অনেক সংগঠন জাহাজ ভাড়া করে হাজির হয়েছিলেন মোরুরোয়া আটোলের দরিয়ায়। তবে তাঁরা আন্তর্জাতিক সীমার কানুন মেনে দাঁড়িয়েছিলেন পর্যবেক্ষক হিসেবে।

ফরাসী সরকারের বক্তব্য

ফরাসী সরকারের অজুহাত হল 'নিউক্লিয়ার নন-প্রলিফারেশন চুক্তি' সই হওয়ার আগে তাঁরা খানকতক পরীক্ষা শেষ করে নিতে চান। আর এই পরীক্ষার জন্য এত আতঙ্কিত হওয়ার কারণ নেই। কারণ তাঁদের পরীক্ষাগুলি করা হবে ভূগর্ভে। প্রবাল স্তরেরও নীচে, ব্যাসল্ট পাথরের স্তরে। এই স্তরটি বেছে নেওয়ার কারণ হল বিস্ফোরণের ফলে, উৎপন্ন তাপে এই পাথরও গলে যাবে। এবং পরে ঠান্ডা হয়ে জমাট বাঁধার সময় তেজস্ক্রিয় আবর্জনা সহ জমাট বাঁধবে। ফলে তেজস্ক্রিয় আবর্জনা বাইরে বেরোবে না। আবদ্ধ থাকবে ভূগর্ভেই। এবং অন্ততঃ পাঁচশ হাজার বছরের মধ্যে কোন বিপদের আশংকা নেই।

অন্যেরা কি বলেন

ফরাসী সরকারের এই আশ্বাসে ভরসা রাখতে পারছে না কেউই। প্রথমতঃ জমাট-বাঁধা ব্যাসল্ট পাথরের কুঠুরীটি এতটা সুরক্ষিত ভাবার কারণ কি? এপর্যন্ত শুধু মাত্র ভূগর্ভেই শদেড়েক বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছে। এই বিস্ফোরণের অভিঘাতেই পুরনো জমাট বাঁধা ব্যাসল্ট কুঠুরীতে ফাটল ধরতে পারে। এছাড়া এর জমাট-বাঁধার পরেই অসম সংকোচনের ফলেও ফাটল সৃষ্টি হতে পারে। সামান্য ফাটল থাকলেই প্রবাল স্তরের মধ্য দিয়ে জল যাতায়াত করবে। এবং দূষিত হবে সমুদ্রের জল।

ইতিমধ্যেই যে তেজস্ক্রিয় বিকিরণ চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে তা তো প্রমাণিতই। ফরাসী সরকারই আশির দশকে যে সমস্ত তদন্তকারী বিশেষজ্ঞদল নিয়োগ করেছিলেন তাদের রিপোর্টেই সেটা প্রমাণিত। 1987 সালে জাক্ কুস্তো কমিশন মন্তব্য করেছিলেন ভূগর্ভে পারমাণবিক বিস্ফোরণের জন্য মোরুরোয়া আটোলের মত দ্বীপ মোটেই উপযুক্ত নয়। কুস্তো কমিশনের অনুসন্ধানেই ধরা পড়েছিল এই দ্বীপ সংলগ্ন জল এবং জলে ভাসমান প্ল্যাংকটনের মধ্যে তেজস্ক্রিয় প্লুটোনিয়াম, কোবল্ট, সিজিয়াম, আয়োডিনের আইসোটোপের অস্তিত্ব। এই তেজস্ক্রিয় বস্তু সামুদ্রিক প্রাণী মারফৎ মানুষের খাদ্যশৃঙ্খলে ঢুকে পড়া কি অসম্ভব?

1984 সালে এটকিন্‌সন্ কমিশনের রিপোর্টে ফাটলের সম্ভাবনার বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছিল। এধংবলা হয়েছিল ব্যাসল্টস্তরের তেজস্ক্রিয় বিকিরণ জল ধৌত হয়ে বেরিয়ে আসা অসম্ভব নয়। তবে সব কমিশনই কাজ করেছেন অত্যন্ত সীমিত ভাবে। বিশদ কাজ করতে দেওয়া হয়নি। দেওয়া হয়নি বেশী সময় ধরে পরীক্ষার সুযোগ। কিন্তু প্রকৃত তথ্য উদ্ধারের জন্য প্রয়োজন পরীক্ষার অবাধ সুযোগ। ফরাসী সামরিক বাহিনী কি সে সুযোগ দেবে?—দেবে না নিশ্চয়ই। ফরাসী প্রশাসন সামরিক বাহিনীর দেওয়া বুলিই আওড়ে চলেছে। ফলে তাতে আস্থা রাখতে পারছেন না কেউই।

আর মাত্র সাতটি বিস্ফোরণ ঘটিয়েই সরকার এই কাজে নিবৃত্ত হবেন এমনটা অনেকেই বিশ্বাস করেন না। ফের তাঁরা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করবেন মনে করেন। তবে কেউ কেউ মনে করেন এর পর থেকে ফ্রান্স 'কম্‌পিউটার সিমিউলেটেড' পরীক্ষার দ্বারাই তাঁদের বোমার কার্যকারিতা পরীক্ষা করবেন। এই 'সিমিউলেশন'-এর জন্যই তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে তাদের এই পর্বের পরীক্ষা!—অনেকের অনুমান।

একা ফ্রান্স নয়

ফ্রান্সের পারমাণবিক বিস্ফোরণের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে গোটা বিশ্বের জনমত যখন একাট্টা ঠিক তখনই গত আগষ্ট মাসে চীনের সরকার অনুরূপ একটি পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ ঘটালেন। বোঝাই যায় চীনের সরকার বিশ্ব জন মতের তোয়াক্কা করেন না। এ বিস্ফোরণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে চীনা পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হয়েছেন ছ'জন 'গ্রীনপীস' কর্মী। তারা হাজির হয়েছিলেন ঐতিহাসিক তিয়েন আন মেন স্কোয়ারে। প্রতিবাদী-ফেস্টুন খুলে দাঁড়াতেই হাজির হয় পুলিশ। পোস্টার-ব্যানারসহ গ্রেপ্তার হন তারা! কোন তফাৎ নেই তথাকথিত সমাজবাদী চীনা সরকার আর কট্টর দক্ষিণপন্থী ফরাসী সরকারের আচরণে!

মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন মৌলের আবিষ্কার

আমেরিকার এক প্রথম সারির বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা সম্প্রতি সবচেয়ে ভারী মৌল আবিষ্কার করেছেন। এই মৌলের নাম রাখা হয়েছে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিয়াম (Administratium)। এতে কোনো প্রোটন কিংবা ইলেকট্রন নেই। তাই এর পারমাণবিক সংখ্যা (atomic number) শূন্য। তবে এতে রয়েছে একটি নিউট্রন, একশো পঁচিশটি সহকারী নিউট্রন, পঁচাত্তরটি উপনিউট্রন এবং একশো এগারোটি সহকারী উপনিউট্রন। মৌলটির পারমাণবিক ভর (atomic mass) তিনশো বারো। এই তিনশো বারোটি কণা একত্রিত হয়ে আছে একধরনের মেসনজাতীয় কণার অবিরাম পারস্পরিক আদানপ্রদানের ফলে। এই মেসনজাতীয় কণাদের নাম রাখা হয়েছে মোরন (moron)।

কোনো ইলেকট্রন না থাকায় অ্যাডমিনিস্ট্রেটিয়াম নিষ্ক্রিয় (inert)। তবে রাসায়নিক উপায়ে এর অস্তিত্ব সহজেই নির্ণয় করা যায়। কেননা, যেকোনো বিক্রিয়া এর সংস্পর্শে এলেই তার গতি হ্রাস পায়। এই মৌলের আবিষ্কারকদের দাবি, যে বিক্রিয়া সাধারণভাবে কয়েক সেকেণ্ডে শেষ হয়ে যাওয়ার কথা, এমনকি সূক্ষ্মমাত্রার অ্যাডমিনিস্ট্রেটিয়ামের উপস্থিতিতে তা সম্পূর্ণ হতে সময় লাগে প্রায় চার দিন।

অ্যাডমিনিস্ট্রেটিয়ামের অর্ধায়ু (half life) প্রায় তিন বৎসর। এই তিন বছরে এর কোনো ক্ষয় (decay) হয় না—তবে এর গঠনে খানিকটা রদবদল (reorganisation) ঘটে যাতে সহকারী নিউট্রন, উপনিউট্রন এবং সহকারী উপনিউট্রনগুলো নিজেদের মধ্যে স্থান পরিবর্তন করে মাত্র। দেখা গেছে, এরকম প্রতিটি পুনর্বিন্যাসের ফলে এর পারমাণবিক ভর খানিকটা বেড়ে যায়।

অন্যান্য গবেষণাগারের পরীক্ষানিরীক্ষায় দেখা গেছে, অ্যাডমিনিস্ট্রেটিয়াম আমাদের পরিবেশের একটি স্বাভাবিক উপাদান। তবে সরকারী সংস্থা, বড়ো মাপের সংগঠন, বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদিতে এই মৌলের আধিক্য দেখা যায়—বিশেষত একেবারে নতুন, ঝকঝকে, তকতকে, পরিপাটি সৌধে।

বিজ্ঞানীরা দেখেছেন, অ্যাডমিনিস্ট্রেটিয়াম যেকোনো মাত্রাতেই ক্ষতিকারক। এই মৌল কোনোখানে জমতে দিলে তা সেখানকার যে কোনো উৎপাদনধর্মী বিক্রিয়াকে (productive reactions) সহজেই বন্ধ করে দিতে পারে।

অ্যাডমিনিস্ট্রেটিয়ামজনিত ক্ষতির কোনো প্রতিকার নেই। এর একমাত্র প্রতিষেধক অ্যাডমিনিস্ট্রেটিয়ামকে নিয়ন্ত্রণে আনা। সেই লক্ষ্যে প্রচেষ্টা চলছে—আশার আলো এখনও দেখা যায়নি।

মূল রচনা : জন মূর (John Moore)

অনুবাদ : সুদীপ্ত সরস্বতী

[মূল লেখাটি প্রকাশিত হয়েছিল "Education WOB" পত্রিকায়।]

সম্পাদকের টীকা : এই পত্রিকার পুরোনো পাঠকদের নিশ্চয়ই মনে আছে, কয়েক দশক আগে প্রকাশিত একটি গবেষণাপত্রে অ্যাডমিনিস্ট্রোনিয়াম (Administronium) নামক একটি মৌল আবিষ্কারের কথা দাবি করা হয়েছিল। মৌলটির ভৌত ও রাসায়নিক গুণাবলী সম্প্রতি আবিষ্কৃত মৌলটির মতোই।

সৌন্দর্য প্রতিযোগিতা ও নারী আন্দোলনের প্রতিবাদ

বেনেট কোলম্যান কোম্পানী আয়োজিত 'মিস্ ইণ্ডিয়া' প্রতিযোগিতাকে কেন্দ্র করে ওই কোম্পানী পরিচালিত দ্যা টাইমস অফ ইণ্ডিয়া অফিসের সামনে এক প্রতিবাদ বিক্ষোভ আয়োজিত হয়। এই উপলক্ষ্যে প্রচারিত 'সংবাদপত্রর জন্য বিবৃতি'টি আমরা এখানে প্রকাশ করলাম। অনুবাদে সহযোগিতা করেছেন পাপড়ি ও বলাই।

সঃ মঃ

ফেমিনা ভারতসুন্দরী প্রতিযোগিতার বিরুদ্ধে আমরা তীব্র ধিক্কার জানাচ্ছি। এই প্রতিযোগিতার আয়োজক বেনেট কোলম্যান এণ্ড কোম্পানী সহযোগিতায় আছেন আরো কয়েকটি নামকরা কোম্পানী। বেনেট কোলম্যানেরই মালিকানায় অপর ইংরাজী নামকরা দৈনিক "টাইমস অফ ইণ্ডিয়া" এবং অন্যান্য পত্রিকায় যেভাবে এই প্রতিযোগিতার খবর ফলাও করে ছাপা হচ্ছে তার বিরুদ্ধেও আমরা প্রতিবাদ জানাই।

একটা গোটা সপ্তাহ ধরে টাইমস ছাপছে নানা রকম খবর, আধপাতা জোড়া নানা বিজ্ঞাপন। বিষয়বস্তু—নারীদেহকে টুকরো টুকরো করে নানা ধরনের প্রতিযোগিতা যার বিজয়িনী সুন্দরীদের গৌরবের ছটায় নিজেদের উজ্জ্বল করতে চায় আয়োজক ব্যবসায়ীরা। যেমন ধরুন, "সানসিল্ক" পয়সা দিচ্ছে "শ্রীমতী রেশমী কোমল কেশিনী"র জন্য, "ইস্ট ওয়েস্ট এয়ার এয়ারলাইন্স" "সবচেয়ে আমুদে মনোহারিণী"কে, ক্লোজ আপের ব্যাগে আছেন "শ্রেষ্ঠ হাসির মিষ্টি মেয়েটি" আর ল্যাকমে পুরস্কৃত করবে "সেরা ত্বকের সুন্দরী"কে, এই প্রতিযোগিতার সংগঠক বেনেট এণ্ড কোলম্যান—এখন এঁরাই আবার "বিশিষ্ট নারীদের" পত্রিকা (!) "ফেমিনা"রও মালিক বটেন।

আগে আমরা দেখেছি, "টাইমস" এবং অন্যান্য গণ-মাধ্যমগুলি অভূতপূর্ব উৎসাহের সঙ্গে বিশ্বসুন্দরী প্রতিযোগিতার খবর করেছে। টাইমস নানান খবর একের পর এক ছেপেছে, পাতার পর পাতা জুড়ে চলেছে সুস্মিতা সেন ও ঐশ্বর্য রাই এর ঝলমলে পোশাক পরা ছবির পরে ছবি, যেন পুরনো যুগের রাজকীয় শোভাযাত্রা। এই ভাবে এরা সৌন্দর্য" প্রতিযোগিতার সাংস্কৃতিক পটভূমিকা তৈরীতে তুলনাহীন ভুমিকা পালন করেছে। মোটেই এটা হঠাৎ ঘটেনি, যে পরপর দুজন "সুন্দরী"ই হলেন ভারতীয় মহিলা। এখন মুক্ত অর্থনীতি আর গ্লোবালাইজেশনের খোলা হাওয়া আগ্রাসী থাবা বাড়াচ্ছে ভারতীয় মধ্যবিত্তদের দিকে, ঠিকমত বাজার তৈরী করতে পারলে শৌখিন পোশাক আর প্রসাধন সামগ্রী বিক্রি করে আসতে পারে কোটি কোটি টাকার মুনাফা। বিদেশী কোম্পানী এবং দেশী বড় বড় ব্যবসায়ীরা বিবেকহীন, তারা মুনাফা লুঠছে এই সৌন্দর্য প্রতিযোগিতা থেকে, "টাইমস" এর মত খবরের কাগজগুলোই বা তাদের বখরা ছাড়বে কেন ?

সাধারণ ক্রেতারা বাজারের গোছা গোছা শ্যাম্পু আর সাবানের মাঝে কোনটা কিনবেন ভেবে দিশাহারা। বিজ্ঞাপনের মধ্যে চোখ ধাঁধানো সুন্দরীদের দেখিয়ে তাদের কোন এক বিশেষ পণ্য কিনতে প্রলুব্ধ করার চেষ্টা চলে। "সৌন্দর্য প্রতিযোগিতা আর মডেলিং যেভাবে মহিলাদের যৌন পণ্য করে

তুলছে, তা আগে কখনো ঘটেনি। কোম্পানীগুলি ও গণমাধ্যমে আজকের সুন্দরীদের যে চেহারা দেখানো হয় তা হল লম্বা, ছিপছিপে, ফর্সা, স্বল্প-বেশী এবং যৌন আবেদনময়ী। ক্যামেরার সামনে এঁরা নিখুঁতভাবে বেড়ালের মত লঘুপায়ে হাঁটেন। নারীদের আজ একে অন্যের সাথে প্রতিযোগিতায় ঠেলে দেওয়া হচ্ছে, যে প্রতিযোগিতার মান ঠিক করে দিচ্ছে ক্রমশঃ বেড়ে ওঠা পণ্যের বাজার, চেষ্টা করা হচ্ছে যাতে সৌন্দর্যের একটি বিশেষ ধারণাই আজকের অল্পবয়সী মেয়েদের ধ্যানজ্ঞান হয়ে ওঠে। গণ-মাধ্যমের মদতে শহরে, গঞ্জে, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে এই প্রবণতা দ্রুত বেগে ছড়াচ্ছে। নামী প্রতিষ্ঠানগুলির কথা ছেড়েই দিন, ছোট ছোট কলেজগুলিতে ও ফ্যাশন শো একটি অপরিহার্য্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এরজন্যে যে সাংঘাতিক দাম নারী-সমাজকে দিতে হচ্ছে তার পরিচয় পাই ক্রমশঃ বেড়ে চলা হিংসা ও শ্লীলতা-হানির ঘটনাগুলিতে। মডেলিং আর সৌন্দর্য প্রতিযোগিতার আবহাওয়ায় দিন দিন বাড়ছে নারী নির্য্যাতন। মডেলিং-এ নাম করার লোভে কত অল্প বয়সী মেয়েরা ফাঁদে পড়েছেন। জোর করে নগ্ন ছবি তোলা আর ধর্ষণের শিকার হচ্ছেন তাঁরা। গণ-মাধ্যমগুলি আবার এসবের রগ রগে বিবরণ দিয়ে পয়সা লুঠছে। দিল্লীতে ঘটেছে নিষ্ঠুরভাবে নগ্ন ছবি তুলতে বাধ্য করার ঘটনা, ব্ল্যাকমেল করে নোংরা ছবিতে নামানো হয়েছে জলগাঁওতে। আজ তাই আমরা টাইমস অফ ইণ্ডিয়ার মত কাগজ ও কোম্পানীগুলিকেই বিশেষ ভাবে দায়ী করছি নারীর এই বিশেষ রূপের ধারণাকে বাজারে ছড়ানোর জন্য, তীব্র ধিক্কার জানাচ্ছি তাদের মুনাফা লোটা ব্যবসাকে। মডেল-দের "সুন্দরী মনোহারিণী নারী" এই প্রতিরূপ বাস্তবে ভারতীয় নারী-দের অবস্থার প্রতি এক নিষ্ঠুর বিদ্রূপ। বেশীর ভাগ ভারতীয় মহিলার জোটেনা চামড়ার জন্য কোন 'সুরক্ষা', হাতে তাঁদের পরিশ্রমের কড়া, সারাদিন পিঠ ভাঙা খাটুনিতে নুয়ে পড়েছেন তাঁরা, বাঁচার লড়াই-এর কঠোর পরিশ্রমই তাঁদের একমাত্র শক্তি।

অল ইণ্ডিয়া ডেমোক্রেটিক
উইমেন'স অ্যাসোসিয়েসন

সহেলি

জেণ্ডার স্টাডিজ গ্রুপ
(দিল্লী ইউনিভার্সিটি)

ন্যাশনাল ফেডারেশন অফ
ইণ্ডিয়ান উইমেন

●　●　●

পুজোর মাইকের আওয়াজ শুরু হবার আগেই এসে গেছে বন্যা। ফি-বছরই যেমন আসে। দশ-পনেরো লক্ষ মানুষ আজ সরাসরি বন্যা-অক্রান্ত। এ প্রসঙ্গে যে প্রশ্নটি প্রত্যেক বছরই ফিরে ফিরে আমাদের অস্বস্তিতে ফেলে তা হোল—সত্যিই কি এই বন্যা প্রকৃতির এক অমোঘ নিয়ম—নাগরিকদের কি কিছুই করার নেই ? সরকারকে শুধু আবেদন করা নয়, এ ব্যাপারে সামাজিক উদ্যোগ আজ খুবই জরুরী। কারণ ঘুষ—ঠিকাদারি ভিত্তিক আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থা বন্যা ঠেকাতে কতটা সক্ষম সে প্রশ্ন আজ আমাদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

রথীনদা,

আপনার চিঠি বেশ কিছুদিন আগে পেয়েছি। উত্তর দিতে দেরি হওয়ায় দুঃখিত। বি. ও. বি.-র গত দু'খানা সংখ্যা আমার ভালো লেগেছে। যদিও মন, খরা, হোমিওপ্যাথি, পরিবেশ, নিউক্লিয়ার-বিরোধিতা, কুসংস্কারবিরোধী আন্দোলন এসব বিষয় নিয়ে যখন আলাদা সংখ্যা বেরোতো, সে সময়কার বি. ও. বি.-র চেহারা আর আজকের চেহারা একেবারে আলাদা।...পশ্চিমবাংলার গণবিজ্ঞান আন্দোলনে ভালো অনুবাদ পত্রিকার অভাব বি. ও. বি. পূরণ করতে পারলে ভালোই হয়।...যাই হোক, কালমেঘ মণ্ডলের লেখা দুটো খুব ভালো লেগেছে। কাল মেঘে ঢাকা তারাটি কে? কী তার পরিচয়? অনুগ্রহ ক'রে জানাবেন।

বি. ও. বি. সম্পর্কে কিছু প্রস্তাব রয়েছে। বেশ কিছু বিষয়ে বি. ও. বি.-তে লেখা বের করা যেতে পারে। যেমন,

1. The Week পত্রিকার 23 July 1995 সংখ্যার cover story-র বিষয় "Are Indians guineapigs in germ war test ?"। এবারকার প্লেগ জীবাণু জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এর ফসল কি না, তা নিয়ে ওতে আলোচনা করা হয়েছে। ঐ পত্রিকার রিপোর্টকে ভিত্তি করে, সম্ভব হলে আরো কিছু যোগ করে—বি. ও. বি.-তে বিস্তারিত আলোচনা করা যেতে পারে—মোটামুটি অনুবাদকর্মের মাধ্যমেই। EPW-র একটা সংখ্যায় "প্লেগঃ অন্য চোখে" নামে একটা লেখা বেরিয়েছে।—যেটা (স্বেচ্ছা-অনুবাদকর্মী পেলে) বি. ও. বি.-তে ছাপা যেতে পারে।

2. সম্প্রতি টাইমস অব ইণ্ডিয়ায় পড়লাম, মেদিনীপুরের কোনো গ্রামে স্লেটপাথরের কোনো কারখানার দূষণের ফলে স্থানীয় বাসিন্দা ও শ্রমিকেরা সিলিকোসিসে আক্রান্ত। এ বিষয়ে চারজন উৎসাহী যুবক একখানা ভালো তথ্যচিত্র তৈরি করেছে। আপনারা তথ্যচিত্রটা একবার দেখে কোনো সপ্তাহান্তে ঘটনাস্থল থেকে বেড়িয়ে আসতে পারেন—মাটির কাছাকাছি গিয়ে রেজমিন তদন্ত হবে আবার "ফান" (fun) ও হবে—বি. ও. বি.-র একটা লেখাও তৈরি হবে।

3. সম্প্রতি BARC তেজস্ক্রিয় দূষণের ব্যাপারে বিতর্কের কেন্দ্রে এসেছিল। কোনো গ্রামের জল সম্ভবত দূষিত হয়েছিল! এ নিয়ে কাগজে হৈ চৈ হয়েছিল। BARCOA-তে লিখলে হয়তো paper cutting পাবেন।

4. ব্রিটেনে ভারতীয় বংশোদ্ভব মহিলাদের গিনিপিগ হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছিল—radioactive iron খাইয়ে। কেউ এ বিষয়ে বি. ও. বি.-তে লিখতে চাইলে তথ্য পাঠাতে পারি।

পত্রিকা-সংক্রান্ত পোষাকী চিঠির এখানেই সমাপ্তি।

সুদীপ্ত সরস্বতী
বোম্বে
14 আগস্ট '95

খুড়োর চোখে সূর্যগ্রহণ

আমাদের রতন খুড়ো সেদিন বসে চা-দোকানে
মুখটা ভারি ব্যাজার ক'রে বল্‌লে আমার কানে কানে—
"হচ্চে নাকি সূর্যগ্রহণ চব্বিশে এই অক্টোবরে
তাই শুনে যে ঘুরছে মাথা বুকের ভেতর কেমন করে।"
আমি বলি গ্রহণ সে তো সময় মাফিক হয়েই থাকে
তুমি কেন বোকার মতন অকারণে ডরবে তাকে ?
খুড়ো বলে "ভাইপো রে তুই বুঝলি না মোর মনের ব্যথা
পুরোপুরি সূর্যগ্রহণ সেটা কি কম ভয়ের কথা !
আস্ত গোটা সূর্যটাকে জ্যান্ত ধরে গিলবে রাহু
অমঙ্গলের মস্ত দানো বাড়িয়ে দেবে বিশাল বাহু !
দেখবি এবার চোখের ওপর কি সাংঘাতিক কাণ্ড ঘটে
বন্যা এবং খরার গুঁতোয় আবাদ কেমন শিকেয় ওঠে !
মারী মড়ক লাগবে দেশে দেখবি কত মানুষ মরে
হানাহানির আগুন জ্বলে উঠবে এবার ঘরে ঘরে !
আর দেরি নয় জুতো ঝাঁটা ঝুলিয়ে দেব ঘরের চালে
অষ্টপ্রহর তুলসীপাতা রাখব পুরে আমার গালে।
গঙ্গাবারি ছিটিয়ে দেব গাঁয়ের যত পুকুর ঘাটে
বাজরা কয়েক গোবর গুলে ছড়িয়ে দেব এ তল্লাটে।
শনি-রাহু-কেতুর পুজো লাগিয়ে দেব পথের মোড়ে
সর্বনেশে শয়তানেরা দেখবি কেমন কান্না জোড়ে।"
আমি বলি ঢের হয়েছে খুড়ো এবার একটু থামো
নইলে তুমি ভির্মি খাবে বাড়বে আবার ফিটের ব্যামো।
তিন শত ষাট বছর আগে এমন গ্রহণ হয়েই গেছে
বল্‌তে পারো এই ভুবনে তখন ক'জন লোক মরেছে ?
সেই গ্রহণে কেউ মরেনি এই গ্রহণে মরবেও না
তাইতো বলি খুড়োমশাই ওসব তোমার ভুল ধারণা।
আজগুবি সব চিন্তা ছেড়ে বরং মাথা ঠাণ্ডা ক'রে
চোখ জুড়ানো দৃশ্যগুলো দেখে নিয়ো নয়ন ভরে !

দিলীপকুমার বৈদ্য

আর এন 34929/79
সপ্তদশ বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা
জুলাই-সেপ্টেম্বর '95

একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকা
বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী
প্রযত্নে অভিজিত লাহিড়ী
পি 252 লেকটাউন ব্লক এ, কলকাতা-89

নীলেশ নায়েকের হত্যাকাণ্ড ঘটিয়ে গোয়া ছেড়ে পালাল ডু পণ্ট কোম্পানি

অবশেষে আমেরিকার মহাশক্তিধর কোম্পানি ডু পণ্ট সিদ্ধান্ত নিয়েছে গোয়ায় তারা বিতর্কিত, পরিবেশ ধ্বংসকারী 'নাইলন 6—6' কারখানা বসাচ্ছে না। তাদের এ কাজে বাধ্য করেছে গোয়ার পরিবেশ আন্দোলনের প্রবল চাপ। সামগ্রিক পরিবেশ আন্দোলনের পক্ষে এ হল এক শুভ ইঙ্গিত। তবে ব্যবসা ও রাষ্ট্রশক্তির হিংস্র আক্রমণের সাক্ষী হিসেবে ডু পণ্ট ফেলে রেখে গেল কিছু গুলিবিদ্ধ আহত নারী-পুরুষ ও নীলেশ নায়েকের মৃতদেহ। এই হল এদের প্রকৃত চেহারা।

পুনশ্চ : খবর পাওয়া গেল যে তামিলনাড়ুর 'একনায়িকা' জয়ললিতা ডু পণ্টকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন বিতর্কিত কারখানাটি সে রাজ্যে বসাতে, এ খবরে আমরা উদ্বিগ্ন। আশা করছি তামিলনাড়ুর সচেতন মানুষ এ বিষয়ে সঠিক পদক্ষেপ নেবেন।

☐ ☐ ☐ ☐ ☐

যাঁরা কাজ করেছেন

কম্পোজ ☐ অরবিন্দ সাউ, বিশ্বনাথ বিশ্বাস, সুজিত সিংহ ॥ মেক আপ ☐ সুকুমার মণ্ডল ॥ মেশিনম্যান ☐ গোবিন্দ মণ্ডল ॥ বাইণ্ডিং ☐ অজয় দাস ॥ মুদ্রক ☐ সত্য পাইন।

বি ও বি-র পক্ষ থেকে ☐ শাশ্বত, সত্যব্রত।

প্রচ্ছদ ☐ রবীন চক্রবর্তী, অলক।

সম্পাদকমণ্ডলীর পক্ষ থেকে রবীন মজুমদার কর্তৃক ইটারনিটি প্রেসের পক্ষে সত্য প্রেস, 10/2 এ, প্যারীমোহন সুর লেন, কলিকাতা-6 থেকে মুদ্রিত।